নি

হুমায়ূন আহমেদ



কাকলী প্রকাশনী

ভূমিকা

'নিউটনের ভুল সূত্র' নামে আমার একটি বৈজ্ঞানিক কল্পগল্প আছে। ঐ গল্পের নায়কের নাম অমরনাথ পাল। 'নি' উপন্যাসের নায়ক মবিনুর রহমান। নাম ভিন্ন হলেও দু'জনের স্বভাব চরিত্রে এক ধরনের মিল আছে। মিলটা ইচ্ছাকৃত। 'নি' বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী নয় — ফ্যান্টাসি ধরনের রচনা। উপমা ডাইজেস্ট পত্রিকায় 'সে' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় সামান্য রদবদল করেছি।

হুমায়ূন আহমেদ
শহীদুল্লাহ হল



নীলগঞ্জ মডেল হাই স্কুলের সায়েন্স টিচার মবিনুর রহমান, বি.এসসি. (অনার্স), এম.এসসি. (প্রথম শ্রেণী) খুব সিরিয়াস ধরনের মানুষ। বয়স ছত্রিশ/সাঁইত্রিশ, রোগা লম্বা। গলার স্বরে কোনরকম কোমলতা নেই। ভদ্রলোক এমনভাবে তাকান যাতে মনে হতে পারে যে সমস্ত পৃথিবীর উপর তিনি বিরক্ত। কোন কারণে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলে তিনি আরাম পাবেন।

এম.এসসি. পাস করার পর সব মিলিয়ে আঠারো বার তিনি চাকরির ইন্টারভ্যু দিলেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যা ঘটল তা হচ্ছে — তিনি ইন্টারভ্যু দিতে ঢুকলেন, বোর্ডের চেয়ারম্যান বললেন, বসুন।

তিনি বসলেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান বললেন, আপনার নাম?

মবিনুর রহমান সহজ গলায় বললেন, নাম তো আপনি জানেন। এই নামেই ডেকে পাঠালেন। আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন?

'আচ্ছা আপনি যেতে পারেন।'

'ধন্যবাদ।'

তিনি শান্ত মুখে উঠে চলে এলেন।

এ জাতীয় মানুষদের কোন চাকরি-বাকরি হবার কথা না। তবে মবিনুর রহমান হাল ছাড়লেন না। দু'বছর চেষ্টা করলেন, প্রাণপণ চেষ্টা। 'ইন্টারভ্যু গাইড' নামের সাতশ একুশ পৃষ্ঠার একটা বই প্রায় মুখস্থ করে ফেললেন। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব, ন্যাটো চুক্তিভুক্ত দেশের নাম, কোন কোন বছর সাহিত্যে নবেল পুরস্কার দেয়া হয়নি, আমেরিকান সব প্রেসিডেন্টের নাম এবং বংশ পরিচয় — পাঠ্য তালিকা থেকে কিছুই বাদ গেল না। খুব ঈশ্বর-বিশ্বাসী না হয়েও মায়ের পীড়াপীড়িতে সিলেটে হযরত শাহ্ জালাল এবং হযরত শাহ্ পরাণের মাজার জিয়ারত করে এলেন। রাজশাহীতে গিয়ে জিয়ারত করলেন শাহ মখদমের মাজার এই তিন মহাপুরুষের কল্যাণেই হয়তবা তিনি নীলগঞ্জ মডেল হাই স্কুলের সায়েন্স টিচারের চাকরিটা পেয়ে গেলেন। অবশ্যি এই চাকরি পাওয়ার পেছনে অন্য একটি কারণ থাকতে পারে। এই চাকরির জন্যে তাঁকে ইন্টারভ্যু দিতে হয়নি। কাগজপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

যাই হোক, নীলগঞ্জ মডেল হাই স্কুলের চাকরির নিয়োগপত্র এবং দু'কেজি মিষ্টি নিয়ে তিনি কুমিল্লার মতলবে তাঁর মা'কে দেখতে গেলেন। মা তখন রোগে শয্যাশায়ী। মবিনুর রহমানের চাকরির খবরে তাঁকে মোটেই আনন্দিত মনে হল না। কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, শেষ পর্যন্ত স্কুল মাস্টার?

মবিনুর রহমান শান্ত গলায় বললেন, স্কুল মাস্টারি খারাপ কিছু না। নাও, মা মিষ্টি খাও।

'আমি মিষ্টি খাব না, বাবা। তুই খা।'

'মিষ্টি না খেলে মনে কষ্ট পাব, মা।'

ভদ্রমহিলা ছেলেকে মনোকষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য মিষ্টি খেলেন। এই মিষ্টিই তাঁর কাল হল। ভোরবেলা পেট নেমে গেল। সন্ধ্যার মধ্যে মৃত্যু।

আশেপাশের সবাই সান্ত্বনা দিতে ছুটে এসে দেখে মবিনুর রহমান পাথরের মত মুখ করে মিষ্টি খাচ্ছে। নিতান্তই অস্বাভাবিক দৃশ্য কিন্তু আসলে তেমন অস্বাভাবিক নয়। মিষ্টিই তার মা'র মৃত্যুর কারণ কি-না এটাই মবিনুর রহমান পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। দু'কেজি কালোজাম খেয়েও তার যখন কিছু হল না তখন তিনি মোটামুটি নিশ্চিত হলেন — বয়সজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুতে খুব বেশি দুঃখিত হবার কিছু নেই। প্রতিটি জীবিত প্রাণীকেই একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর মরতে হবে। তবে এই মৃত্যু মানে পুরোপুরি ধ্বংস নয়। মানুষের শরীরের অযুত, কোটি, নিযুত ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলস যেমন — ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন — এদের কোন বিনাশ নেই। এরা থেকেই যাবে। ছড়িয়ে পড়বে সারা পৃথিবীতে। কাজেই মানুষের মৃত্যুতে খুব বেশি কষ্ট পাবার কিছু নেই।

মবিনুর রহমান তাঁর বসতবাড়ি এবং অল্প যা জমিজমা ছিল বিক্রি করে দিয়ে নীলগঞ্জ চলে এলেন। তাঁর সঙ্গে দুই ট্রাংক বই, একটা ম্যাকমিলন কোম্পানির দূরবীন। দূরবীনটা ঢাকা থেকে অনেক দাম দিয়ে কেনা। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর শখ ছিল ভাল একটা দূরবীন কেনা। টাকার অভাবে কেনা হয়নি। জমি বিক্রির টাকাটা কাজে লাগল। এই সঙ্গে একটা মাইক্রোসকোপ কিনতে পারলে হত। টাকায় কুলালো না।

নীলগঞ্জ হাই স্কুলে মবিনুর রহমানের আট বছর কেটে গেছে। শুরুতে তাঁকে যতটা বিচিত্র বলে মনে হয়েছিল এখন আর ততটা মনে হয় না। মবিনুর রহমান বদলান নি, আগের মতই আছেন। ছাত্ররা এবং সহকর্মী শিক্ষকরা তাঁর আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এইটুকু বলা যায়। তাঁর আচার-আচরণের সামান্য নমুনা দেয়া যাক।

তাঁর বুক পকেটে সব সময় একটা গোলাকার নিকেলের ঘড়ি থাকে। নীলগঞ্জে আসার আগে চৌদ্দশ টাকায় ইসলামপুর থেকে এই ঘড়িটা কেনা হয়েছে। সাধারণ ঘড়ি

নয় — একের ভেতর তিন। ঘড়ির সঙ্গে আছে স্টপ ওয়াচ এবং একটি আর্দ্রতা মাপক কাঁটা।

ক্লাসে ঢোকার আগে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ঘড়িতে সময় দেখে নেন। ক্লাস শেষের ঘন্টা পড়া মাত্র আবার ঘড়ি বের করে সময় দেখেন। তখন যদি তাঁর কপাল কুঁচকে যায় তাহলে বুঝতে হবে ঘন্টা ঠিকমত পড়েনি। দু'এক মিনিট এদিক-ওদিক হয়েছে।

ক্লাসে ঢুকে প্রথমেই আজকের আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, যেমন — আজ বাতাসের আর্দ্রতা ৭৭ পারসেন্ট। বৃষ্টিপাত হবার সম্ভাবনা। আবহাওয়া সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী খুব লেগে যায়। তিনি বৃষ্টি হবে বলেছেন অথচ বৃষ্টি হয়নি এমন কখনো দেখা যায়নি।

তাঁর ক্লাসে ছাত্রদের নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকতে হয়। হাসা যায় না, পেনসিল দিয়ে পাশের ছেলের পিঠে খোঁচা দেয়া যায় না, খাতায় কাটাকুটি খেলা যায় না। মনের ভুলেও কেউ যদি হেসে ফেলে তিনি হতভম্ব হয়ে দীর্ঘ সময় তার দিকে তাকিয়ে থেকে কঠিন গলায় বলেন, সায়েন্স ছেলেখেলা নয়। হাসাহাসির কোন ব্যাপার এর মধ্যে নেই। সায়েন্স পড়বার সময় তুমি হেসেছ, তার মানে বিজ্ঞানকে তুমি উপহাস করেছ। অন্যায় করেছ। তার জন্যে শাস্তি হবে। আজ ক্লাস শেষ হবার পর বাড়ি যাবে না। পাটিগণিতের সাত প্রশ্নমালার ১৭, ১৮, ১৯ এই তিনটি অংক করে বাড়ি যাবে। ইজ ইট ক্লিয়ার?

মবিনুর রহমান স্কুল থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে দু'কামরার একটা পাকা ঘরে একা বাস করেন। ঘরটি জরাজীর্ণ। ভেঙ্গে পড়তে পড়তেও কেন জানি পড়ছে না। ছোটখাট ভূমিকম্প কিংবা দমকা বাতাসের জন্যে অপেক্ষা করছে। তাকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হয় না। বাড়িটি সাপের আড্ডাখানা। বর্ষাকালে যেখানে-সেখানে সাপ দেখা যায়। বাড়ির মালিক কালিপদ রূপেশ্বর স্কুলের দপ্তরী। সাপের ভয়েই সে পূর্বপুরুষের ভিটায় বাস করে না। সাপের কামড়ে তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী এবং দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রথম সন্তান মারা গেছে। মবিনুর রহমান সেই বাড়িতে সুখেই আছেন। স্বপাক আহার করেন। তাঁকে নিরামিষভোজী বলা চলে। মাছ মাংস খান না। না খাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে মাছ-মাংস রাঁধতে জানেন না। তাঁর বাড়িটা রূপেশ্বর নদীর ধারে। শীতকালে এই নদীতে পায়ের পাতাও ভিজে না। বর্ষাকালে কিছু পানি হয়। গত বর্ষায় মবিনুর রহমান দেড় হাজার টাকা দিয়ে একটা নৌকা কিনেছেন। নৌকার কোন মাঝি নেই। নৌকা ঘাটে বাঁধা থাকে। মাঝে মাঝে তিনি নৌকার ছাদে সারারাত বসে থাকেন। নৌকার ভেতরটাও সুন্দর। ঘরের মত। দু'দিকে দরজা আছে। বাথরুম আছে। বিছানা বালিশ দিয়ে ভেতরটা চমৎকার গোছানো। মবিনুর রহমানের প্রিয় কিছু বই নৌকায় থাকে। অধিকাংশই গ্রহ নক্ষত্র বিষয়ক বই।

এই জাতীয় আধাপাগল নিঃসঙ্গ মানুষকে সবাই খানিকটা ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখে। মবিনুর রহমানের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এই অঞ্চলের মানুষদের প্রচুর ভালবাসা তিনি পেয়েছেন। এই ভালবাসা পাবার পেছনের আরেকটি কারণ হচ্ছে, তিনি শিক্ষক হিসেবে প্রথম শ্রেণীর। ইতিমধ্যেই অংকের ডুবো জাহাজ হিসেবে তাঁর খ্যাতি রটেছে। ডুবো জাহাজ নামকরণের রহস্য হচ্ছে তিনি যে খুব ভাল অংক জানেন এটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

আজ বৃহস্পতিবার, হাফ স্কুল।

সেকেণ্ড পিরিয়ডে মবিনুর রহমানের কোন ক্লাস নেই। তিনি টিচার্স কমনরুমে তাঁর নিজের চেয়ারে চুপচাপ বসে আছেন। তাঁর বুক পকেটের ঘড়ি শতকরা আশি ভাগ হিউমিডিটির কথা বলছে। কিন্তু আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। ব্যাপারটা ঠিক মিলছে না। মবিনুর রহমানের ভুরু কুঁচকে আছে এই কারণে। কমনরুমে আরো কিছু শিক্ষক আছেন। তাঁরা সরকারী ডিএ নিয়ে আলাপ করছেন। এবারের সরকারী সাহায্য এখনো এসে পৌছায়নি। মবিনুর রহমান এইসব আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন না। কখনোই করেন না। স্কুলের ধর্ম ও আরবী শিক্ষক জালালুদ্দিন সাহেবের চেয়ার মবিনুর রহমানের চেয়ারের ঠিক পাশেই। পাশাপাশি বসতে হয় বলেই বোধ হয় দু'জনের মধ্যে সামান্য সখ্যতা আছে। জালালুদ্দিন সাহেব মবিনুর রহমানকে তুমি তুমি করে বলেন। তাঁর কথাবার্তা থেকে মনে হতে পারে যে বিজ্ঞান সম্পর্কে তার প্রচুর কৌতূহল। তা ঠিক না। কোন বিষয় সম্পর্কেই তাঁর কোন আগ্রহ নেই। ভদ্রলোক কোন ক্লাসই ঠিকমত নেন না। আজও ক্লাস শেষ হবার কুড়ি মিনিট আগে বের হয়ে এলেন। মবিনুর রহমানের পাশে বসতে বসতে মধুর গলায় বললেন, তারপর মবিন, তোমার সায়েন্সের খবর কি?

'কোন খবরটা জানতে চান?'

'বৃষ্টি হবে কি হবে না?'

'বৃষ্টি হবে। হিউমিডিটি ৮০।'

জালালুদ্দিন পানের কৌটা খুলতে খুলতে বললেন, বৃষ্টি যে হবে এটা বলার জন্য তোমার সায়েন্স লাগে না। আষাঢ় মাস, বৃষ্টি তো হবেই। পান খাবে না-কি?

'জ্বি-না।'

'খাও একটা। জর্দা দেয়া আছে। আকবরী জর্দা। অতি সুঘ্রাণ।'

'আমি পান খাই না।'

'এমনভাবে তুমি কথাটা বললে যেন পান খাওয়া বিরাট অপরাধ। পান খাওয়া কোন অপরাধ না। এটা হজমের সহায়ক। দাঁত ভাল থাকে।'

জালালুদ্দিন একসঙ্গে দুটো পান মুখে দিলেন। আঙুলের ডগায় চুন নিতে নিতে বললেন, আচ্ছা মবিন, এই যে পানের সঙ্গে আমরা চুন খাই। কেন খাই? তোমার সায়েন্স কি বলে?

'আপনি সত্যি জানতে চান?'

'অবশ্যই চাই। আরবী পড়াই বলে সায়েন্স জানব না? সায়েন্সের সঙ্গে এরাবিকের তো কোন বিরোধ নাই।'

মবিন শীতল গলায় বললেন, পানের সঙ্গে চুন কেন খাওয়া হয় আমি ব্যাখ্যা করছি। মন দিয়ে শুনুন।

'শুনছি। তুমি হাসি মুখে বল। মুখ এমন শুকনো করে রেখেছ কেন?'

মবিনুর রহমান ক্লাসে বক্তৃতা দেয়ার ঢং-এ বললেন,

'শুধু শুধু পান চিবুলে দেখবেন টকটক লাগছে। টক লাগার কারণ হচ্ছে পানে আছে এক ধরনের এ্যাসিড বা অম্ল। অম্ল টক স্বাদযুক্ত চুন হচ্ছে এক জাতীয় ক্ষার। ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড। এই ক্ষার অম্লকে প্রশমিত করে। এই জন্যেই পানের সঙ্গে চুন খেতে হয়।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা। ভাল কথা। অম্ল এবং ক্ষার। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। অনেকদিন থেকে মনের মধ্যে একটা খটকা ছিল। আচ্ছা, এখন বল তো দেখি, তেঁতুলের সঙ্গে চুন মিশালে কি তেঁতুলের টক-ধর্ম চলে যাবে?'

মবিনুর রহমান চুপ করে রইলেন। এই বিষয়টা তাঁর জানা নেই। অনুমানের উপর কিছু বলা ঠিক হবে না। বিজ্ঞান অনুমানের উপর চলে না। পরীক্ষা করে তারপর বলতে হবে।

জালালুদ্দিন পানের পিক ফেলতে ফেলতে বললেন, কি কথা বলছ না কেন? কি হবে তেঁতুলের সঙ্গে চুন মেশালে?

'কাল আপনাকে বলব।'

'কাল কেন? আজই বল।'

'আজ বলতে পারব না। পরীক্ষা করে তারপর বলব।'

'একদিন যাব তোমার বাড়িতে। তোমার চোঙটা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাব।'

'দূরবীনের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, দূরবীন। বৃহস্পতির বলয় না-কি দেখা যায়, হেড স্যার বলছিলেন।'

'হ্যাঁ দেখা যায়। চৈত্র মাসে দেখা যায়। আকাশ পরিষ্কার থাকে। চৈত্র মাস আসুক, আপনাকে দেখাব।'

মবিনুর রহমান উঠে পড়লেন। তাঁর ক্লাসের সময় হয়ে গেছে। ঘণ্টা পড়বার আগেই ক্লাসের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। দীর্ঘ আট বছরের নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা ঠিক না।

ক্লাস টেন, সেকশান বি–র সঙ্গে ক্লাস। পড়বার বিষয়বস্তু হচ্ছে আলো। আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ। বড় চমৎকার বিষয়। আলো হচ্ছে একই সঙ্গে তরঙ্গ এবং বস্তু। কি অসাধারণ ব্যাপার। ক্লাস টেনের ছেলেগুলি অবশ্যি এইসব বুঝবে না, তবে বড় হয়ে যখন বুঝবে তখন চমৎকৃত হবে।

মবিনুর রহমান ক্লাসে ঢুকেই বললেন, আজ বাতাসের আর্দ্রতা শতকরা আশি। যদিও বাইরে রোদ দেখা যাচ্ছে তবু আমার ধারণা সন্ধ্যানাগাদ বৃষ্টিপাত হবে। এখন তোমরা বল আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে কত? যারা জান ডান হাত তোল। যারা জান না বাঁ হাত তোল।

সাতজন ছেলে ডান হাত তুলল। মবিনুর রহমানের মন খারাপ হয়ে গেল। তাঁর ধারণা ছিল সবাই ডান হাত তুলবে। মাত্র সাতজন? ছেলেগুলি কি সায়েন্সে মজা পাচ্ছে না? তা কি করে হয়?

'তুমি বল, আলোর গতিবেগ কত?'

'প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল, স্যার।'

'ভেরী গুড। এখন তুমি বল — হ্যাঁ, তুমি ইয়েলো শার্ট, তুমি বল — আলোর গতি কি এরচে' বেশি হতে পারে?'

'জ্বি–না স্যার।'

'কেন পারে না?'

'এটাই স্যার নিয়ম।'

'কার নিয়ম?'

'প্রকৃতির নিয়ম।'

'ভেরী গুড। ভেরী ভেরী গুড। প্রকৃতির কিছু নিয়ম আছে যার কখনো কোন ব্যতিক্রম নেই। ব্যতিক্রম হতে পারে না। যেমন ধর মাধ্যাকর্ষণ। একটা পাকা আম যদি গাছ থেকে পড়ে তা পড়বে মাটিতে। আকাশে উড়ে যাবে না। ইজ ইট ক্লিয়ার?'

'জ্বি স্যার।'

'মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক কে?'

'নিউটন।'

'নামটা তুমি এমনভাবে বললে যেন নিউটন হলেন একজন রাম–শ্যাম, যদু–মধু, রহিম–করিম, বজলু–ফজলু। নাম উচ্চারণে কোন শ্রদ্ধা নেই। শ্রদ্ধার সঙ্গে নাম বল।'

ছাত্রটি মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন।

মবিনুর রহমান শুকনো মুখে বললেন, একজন অতি শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানীর নাম অশ্রদ্ধার সঙ্গে বলার জন্যে তোমার শাস্তি হবে। ক্লাস শেষ হলে আজ বাড়ি যাবে না। পাটিগণিতের বার প্রশ্নমালার একুশ এবং বাইশ এই দু'টি অংক করে বাড়ি যাবে। ইজ ইট ক্লিয়ার?

ফোর্থ পিরিয়ড শেষ হবার আগেই আকাশে মেঘ জমতে শুরু করল। ঝুম বৃষ্টি নামল ক্লাসের শেষ ঘণ্টার পর। ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মত বৃষ্টি। মবিনুর রহমান টিচার্স কমনরুমে বসে রইলেন। স্কুল ফাঁকা হতে শুরু করেছে। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই সবাই নেমে পড়ছে। পুরো স্কুলে এখন মানুষ আছে তিনজন। দপ্তরী কালিপদ, মবিনুর রহমান এবং ক্লাস টেনের হলুদ শার্ট গায়ে দেয়া ছাত্র মফিজ। বার প্রশ্নমালার অংক দু'টি সে কিছুতেই কায়দা করতে পারছে না।

মবিনুর রহমান চুপচাপ তাঁর চেয়ারে বসে আছেন। খোলা জানালায় বৃষ্টির ছাঁট আসছে। তিনি তাকিয়ে আছেন বৃষ্টির দিকে। তাঁর মন বেশ খারাপ। গত দশদিন ধরেই রোজ সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি হচ্ছে। দূরবীন দিয়ে আকাশ দেখা হচ্ছে না। বর্ষাকালের মেঘমুক্ত আকাশ দূরবীন দিয়ে দেখার জন্যে খুব ভাল। আকাশে ধুলোবালি থাকে না। অনেক দূরের নক্ষত্রও স্পষ্ট দেখা যায়।

মবিনুর রহমান উঁচুগলায় ডাকলেন, কালিপদ।

কালিপদ ছুটে এল।

'মফিজ নামের ছেলেটাকে দু'টা অংক করতে দিয়েছিলাম, অংক হয়েছে কি–না খোঁজ নিয়ে আস।'

'জ্বি, আচ্ছা স্যার।'

'তুমি স্কুল বন্ধ করে চলে যাও। আমার প্রাইভেট টিউশ্যানী আছে। সন্ধ্যাবেলা স্কুল থেকে যাব। আমি তালা দিয়ে যাব।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

কালিপদ কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে জানাল, ছেলেটির অংক দু'টা এখনো হয় নি। মবিনুর রহমান তাঁর সামনের ডেস্কের ড্রয়ার থেকে সাদা কাগজ বের করলেন। অতি দ্রুত সেই কাগজে অংক দু'টি করলেন। কাগজের এক মাথায় লিখলেন — মফিজ, তুমি আরো মন দিয়ে পড়াশোনা করবে। প্রকৃতি তোমাকে যে মস্তিষ্ক দিয়েছে তা প্রথম শ্রেণীর। সেই মস্তিষ্ক ব্যবহার করা তোমার কর্তব্য।

'কালিপদ, ছেলেটাকে এই কাগজটা দিয়ে আস। সে যেন দেখে দেখে অংক দু'টা বোর্ডে করে রাখে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'অংক করা হলে তাকে চলে যেতে বল।'

'জ্বি, আচ্ছা।'

স্কুলঘর এখন পুরো ফাঁকা। মবিনুর রহমান চেয়ার ছেড়ে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালেন। ঘড়িতে তখন বাজে ছ'টা। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি দু'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা – – এই চার ঘণ্টা তিনি একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাতাসে মাথার চুল না নড়লে তাঁকে মূর্তি বলেই মনে হত। দীর্ঘ সময় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকায় এই ব্যাপারটা শুধু কালিপদ জানে। সে কাউকে তা বলেনি। মাঝে মাঝে এই মানুষটাকে তার ভয় ভয় করে। অথচ মানুষটা ভাল। প্রতি মাসের তিন তারিখে বাড়ি ভাড়া বাবদ একশ টাকা তাকে দিচ্ছে। তবে কালিপদের ধারণা এই বর্ষাকালেই মানুষটা সাপের কামড়ে মারা যাবে। বাড়ি ভাড়া হিসেবে ১০০ টাকা আসা বন্ধ হতে বেশি দেরি নেই।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ছ'টায় মবিনুর রহমান এই অঞ্চলের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, স্কুল কমিটির মেম্বার, প্রাক্তন চেয়ারম্যান আফজাল সাহেবের বাড়ির গেট খুলে ভেতরে ঢুকলেন। আফজাল সাহেবের বড় মেয়ে রূপাকে গত ছ'মাস ধরে তিনি পড়াচ্ছেন। রূপা এই বছর এস.এস.সি. দেবে। গত বছর দেবার কথা ছিল, টাইফয়েড হওয়ায় দিতে পারেনি। এবার দিচ্ছে। রূপার ধারণা এবারো সে পরীক্ষা দিতে পারবে না। পরীক্ষার ঠিক আগে চিকেন পক্স কিংবা হাম হবে। মেয়েটি অসম্ভব বুদ্ধিমতী তবে পড়াশোনায় মন নেই। কখনো সময়মত আসবে না। এমনও হয়েছে তিনি আধঘণ্টা বসে আছেন রূপার দেখা নেই।

আজ অবশ্যি সঙ্গে সঙ্গে চলে এল। চোখ কপালে তুলে বলল, স্যার এই বৃষ্টির মধ্যে আসছেন। আমি ভাবলাম, আসবেন না।

মবিনুর রহমান বিরক্ত গলায় বললেন, ঝড়বৃষ্টির জন্যে আসিনি এরকম কি কখনো হয়েছে?

'একবার হয়েছে স্যার। মে মাসের দু' তারিখে আপনি আসেননি। ঝড় হচ্ছিল তাই আসেননি।'

মবিনুর রহমান চুপ করে গেলেন। কথা সত্যি। মে মাসের দু' তারিখে তিনি আসেননি। মেয়েটা এটা মনে করে রাখবে তা ভাবেননি। এই মেয়ের অনেক কিছুই তিনি বুঝতে পারেন না। যেমন, মাঝে মাঝে সে পড়া বন্ধ করে এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। তিনি বিরক্ত হয়ে যখন ধমক দেন — কি ব্যাপার, পড়ছ না কেন? তখনো চোখ নামিয়ে নেয় না। ক্লান্ত গলায় বলে, আজ আর পড়তে ভাল লাগছে না, স্যার। আজ আপনি যান। বলেই অতি অভদ্রের মত উঠে চলে যায়।

রূপা বলল, স্যার, একটা গামছা এনে দেই। মাথাটা মুছে ফেলুন, মাথা ভিজে গেছে।

'অসুবিধা হবে না — তুমি অংক নিয়ে বস। বার প্রশ্নমালার একুশ এবং বাইশ এই দু'টা অংক কর তো দেখি পার কি–না।'

রূপা নিমিষেই অংক দু'টা করে ফেলল। মবিনুর রহমান মনে মনে বললেন, ভেরী গুড, ভেরী গুড। এই মেয়েটির সঙ্গে বেশির ভাগ কথাই তিনি মনে মনে বলেন।

'স্যার, অংক দু'টা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। আচ্ছা শোন, তোমাদের বাসায় কি তেঁতুল আছে?'

'জ্বি স্যার, আছে।'

'একটা পিরিচে করে সামান্য তেঁতুল আর খানিকটা চুন আন। পান খাওয়ার চুন।'

'কি করবেন স্যার?'

'ছোটখাট একটা এক্সপেরিমেন্ট। পিরিচটা দিয়ে তুমি এ্যালজেব্রা নিয়ে বস। কাল করেছিলে দশ প্রশ্নমালা। আজ এগারো।'

রূপা উঠে চলে গেল । ফিরতে অনেক দেরি করল। মেয়েটার এই এক অভ্যাস — একবার উঠে গেলে ফিরতে অনেক দেরি করে। মবিনুর রহমান বিরক্ত মুখে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। এবার নিশ্চয় বন্যা হবে। এক বছর পর পর দেশে বন্যা হচ্ছে। গত বছর হয়নি। এবার তো হবেই।

'স্যার, নিন তেঁতুল। খানিকটা লবণও নিয়ে এসেছি। স্যার লবণ লাগবে?'

'না। তোমাকে তো লবণ আনতে বলিনি। তুমি এ্যালজেব্রা নিয়ে বস।'

মবিনুর রহমান আঙুল দিয়ে ডলে ডলে চুন এবং তেঁতুল মেশাচ্ছেন। রূপা নিঃশব্দে অংক করে যাচ্ছে। মবিনুর রহমান এক সময় হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, রূপা অংক করা বন্ধ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। ঘোর–লাগা চোখের দৃষ্টি।

তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, কি ব্যাপার, কি দেখছ? অংক কর।

'আজ আর করব না, স্যার।'

'কেন?'

'ভাল লাগছে না।'

রূপা তাকিয়ে আছে। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছে না। মবিনুর রহমান চুন মেশানো তেঁতুল খানিকটা জিভে লাগালেন। তিতা তিতা লাগছে। টক ভাব এখনো আছে। অম্ল এবং ক্ষারের প্রশমন ক্রিয়া পুরোপুরি শেষ হয়নি বলে মনে হচ্ছে। আরো খানিকটা চুন মেশানো দরকার। এবং একটু বোধ হয় গরম করা দরকার।

'রূপা!'

'জ্বি স্যার।'

'আরেকটু চুন এনে দাও তো।'

রূপা উঠে দাঁড়াল। ইতস্তত করে বলল, আচ্ছা স্যার, আমার মধ্যে কি কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন?

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কি পরিবর্তন?

'সত্যি লক্ষ্য করেননি?'

'না তো।'

'প্রথম আমার গায়ে ছিল সবুজ রঙের একটা শাড়ি। এখন একটা ডোরাকাটা শাড়ি। যখন তেঁতুল আনতে বললেন, তখন শাড়ি বদলালাম।'

'ও।'

'সবুজ শাড়িটা ময়লা ছিল তো তাই বদলেছি।'

'ও আচ্ছা।'

চুন নিয়ে রূপা এল না। একটা কাজের মেয়ে একগাদা চুন দিয়ে গেল। সরু গলায় বলল, আপার মাথা ধরছে আইজ আর পড়ব না।

'আচ্ছা।'

'আম্মা আফনেরে ভাত খাইয়া যাইতে বলছে।'

'না, ভাত খাব না। চলে যাব। শোন, আমি তেঁতুল আর চুন নিয়ে যাচ্ছি, কেমন? ঘরে বাড়তি ছাতা থাকলে আমাকে একটা ছাতা দাও।'

বাড়তি ছাতা ছিল না।

মবিনুর রহমান বাড়িতে ফিরলেন কাকভেজা হয়ে। নদীর পাশ ঘেঁষে বাড়ি ফেরার রাস্তা। নদী ফুলে-ফেঁপে একাকার হয়েছে। কান পাতলেই নদীর ভেতর থেকে আসা হুঁ-হুঁ গর্জন শোনা যায়। খানিকটা ভয় ভয় লাগে। শুধু ভয় না। ভয়ের সঙ্গে এক ধরনের আনন্দও মেশানো থাকে।

মবিনুর রহমান বাড়ি ফিরেই রান্না চড়ালেন। হাড়িতে দু'ছটাক আন্দাজ পোলাওয়ের চাল, মুগের ডাল, কয়েক টুকরা আলু এবং তিন চামচ ঘি। অল্প আঁচে অনেকক্ষণ সিদ্ধ হবে। এক সময় অতি সুস্বাদু ঘন স্যুপের মত একটা জিনিস তৈরি হবে। গরম গরম খেতে চমৎকার লাগবে। ডিম থাকলে ভাল হত। ডিমটাও ছেড়ে দেওয়া যেত। প্রোটিন কম খাওয়া হচ্ছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করতে করতে রাত দশটা বেজে গেল। বৃষ্টির বিরাম নেই। মনে হচ্ছে আকাশটা যেন অনেক জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে। মবিনুর রহমান একটা টর্চ এবং ছাতা হাতে ঘরে তালা দিয়ে বের হলেন। আজ রাতটা তিনি নৌকায় কাটাবেন। নৌকায় বিছানা বালিশ সবই আছে। প্রশস্ত পাটাতনে তোষক বিছানো। দু'পাশের দরজা লাগিয়ে নৌকায় শুয়ে থাকলে চমৎকার লাগবে। সারারাত নদীতে বৃষ্টি পড়ার শব্দ শোনা যাবে। বাতাসে নৌকা এপাশ-ওপাশ করবে। চারদিকে থাকবে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। মাঝে

মাঝে বিদ্যুৎ চমকাবে। সেই বিদ্যুৎ চমকে চারদিক আলো হয়ে আবার অন্ধকার হয়ে যাবে।

মবিনুর রহমান নৌকার বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়লেন। গাঢ় ঘুম, এত গাঢ় যেন মৃত্যুর কাছাকাছি। এই ঘুমের মধ্যেই তিনি অতি বিচিত্র একটি স্বপ্ন দেখলেন। যেন কয়েকজন বুড়ো মানুষ তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। সবার চেহারা এক রকম। তাকিয়ে থাকার ভঙ্গিও এক রকম। সবার মুখেই এক ধরনের প্রচ্ছন্ন হাসি। সেই হাসি একই সঙ্গে কঠিন এবং কোমল। তাঁরা কথা বলতে শুরু করলেন।

সবাই এক সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁদের গলার স্বর এক রকম। সবাই এক সঙ্গে কথা বলার জন্যেই বোধ করি এক ধরনের অস্বাভাবিক রেজোনেন্স তৈরি হচ্ছে। শব্দটা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। শরীরের প্রতিটি কোষ ঝনঝন করে বাজছে। তার চেয়েও বড় কথা, ঘুমের মধ্যেই মবিনুর রহমানের মনে হল এই বৃদ্ধদের তিনি আগেও স্বপ্ন দেখেছেন। অতি দূর শৈশবে। যার স্মৃতি অস্পষ্টভাবে হলেও রয়ে গেছে।

'মবিনুর রহমান!'

'জ্বি।'

'তুমি কি মাতৃগর্ভের স্মৃতি মনে করতে পারছ?'

'না।'

'মাতৃগর্ভে যখন ছিলে তখন চারদিকে ছিল নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। এখনো কি চারদিকে অন্ধকার নয়?'

'হ্যাঁ।'

'মাতৃগর্ভে তুমি এক ধরনের তরল পদার্থের উপর ভাসছিলে — যাকে তোমরা বল এমনোটিক ফ্লুয়িড। এখনো তুমি ভাসছ পানির উপর। দোল খাচ্ছ। খাচ্ছ না?'

'জ্বি।'

'খানিকটা হলেও মাতৃগর্ভের মত অবস্থা তৈরি হয়েছে। নয় কি?'

'হ্যাঁ, তৈরি হয়েছে। আপনারা কে?'

'আমরা হচ্ছি — নি।'

'নি?'

'হ্যাঁ — নি। আমরা স্বপ্ন তৈরি করি।'

'বুঝতে পারছি না।'

'এখন বুঝতে না পারলেও আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে। আমরা তোমাকে বুঝতে সাহায্য করব। তোমাকে সাহায্য করার জন্যেই আমরা এসেছি । তুমি আমাদেরই একজন।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'তুমিও একজন — নি।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'তোমার মধ্যে আছে প্রচণ্ড ক্ষমতা। তুমি এই ক্ষমতা ব্যবহার কর।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'মন দিয়ে শোন — তোমার ভেতর আছে প্রচণ্ড ক্ষমতা। অকল্পনীয় ক্ষমতা। ক্ষমতা ব্যবহার কর। স্বপ্ন দেখ। স্বপ্ন দেখ।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

মবিনুর রহমান ঘুমের ঘোরেই কাতর শব্দ করলেন, তারপর তলিয়ে গেলেন গভীর ঘুমে। ঘুম যখন ভাঙলো তখন চারদিক আলো হয়ে আছে। অনেক বেলা হয়েছে, কড়া রোদ। দীর্ঘ আট বছর পর এই প্রথম মবিনুর রহমানের মনে হল আজ স্কুলে না যেয়ে সারাদিন নৌকায় বসে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকলে কেমন হয়?



নীলগঞ্জ হাই স্কুলের হেড মাস্টার হাফিজুল কবির সাহেব একটা ছোট সমস্যা নিয়ে বিব্রত। সমস্যাটির বয়স সাত মাস। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব সমস্যাই খানিকটা পাতলা হয়। তাঁরটা হচ্ছে না। বরং খানিকটা ঘোরালো হয়ে উঠছে। ব্যাপারটা এ রকম — ফুড ফর ওয়ার্ক প্রোগ্রামে গত মাসে নীলগঞ্জ হাই স্কুলকে পঞ্চাশ বস্তা গম দেয়া হয়েছিল। তিনি মবিনুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে গম আনতে গেলেন। উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেব তাঁকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, একটা সমস্যা হয়েছে হেড মাস্টার সাহেব।

তিনি বললেন, কি সমস্যা?

'পঞ্চাশ বস্তা গম তো আপনাকে দিতে পারছি না। দশ বস্তা নিয়ে যান।'

'দশ বস্তা?'

'হ্যাঁ, দশ। আর ক্যাশ টাকা দিচ্ছি পাঁচ হাজার।'

হেড মাস্টার সাহেব বললেন, খাতায় সই করতে হবে পঞ্চাশ বস্তা গম?

'হ্যাঁ। নানান ফ্যাকরা রে ভাই। সাহায্যের গম বার ভূতে লুটে খাচ্ছে। সৎভাবে যে কিছু করব তার উপায় নেই। আপনি তো সবই বুঝেন। বুঝেন না?'

'জ্বি – বুঝব না কেন?'

'দশ বস্তা গম নিয়ে যান। আর নিতে যদি না চান কোন অসুবিধা নেই। আমরা অন্য প্রোগ্রামে ট্রান্সফার করে দেব। নেবেন, না নেবেন না?'

'নিব।'

'আসুন তাহলে খাতায় সই করুন।'

হেড মাস্টার সাহেব বিচক্ষণ লোক। নিজে সই করলেন না, মবিনুর রহমানকে সই করতে বললেন। তিন মাস পর উপর থেকে চিঠি এল — বিশেষ ব্যবস্থায় নীলগঞ্জ হাই স্কুলকে যে একশ বস্তা গম দেওয়া হয়েছিল তা কিভাবে খরচ হয়েছে? উন্নয়নের কোন কোন খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা যেন অতি সত্বর জানানো হয়।

হেড মাস্টার সাহেব ছুটে গেলেন উপজেলা চেয়ারম্যানের কাছে। আমতা আমতা করে বললেন, একশ বস্তা গমের কথা কিভাবে এল স্যার?

চেয়ারম্যান সাহেব হাই তুলে বললেন, কাগজপত্রে তাই লেখা আছে, আপনি নিজে সই করে নিয়েছেন।

'আমি সই করিনি স্যার, মবিনুর রহমান করেছে।'

'মবিনুর রহমানটা কে?'

'আমাদের স্কুলের সায়েন্স টিচার।'

'তাহলে তো আপনি বেঁচেই গেলেন। তদন্ত কমিটি করে দেন। ব্যাটার চাকরি চলে যাক। সব সমস্যার সমাধান। নতুন টিচার নিয়ে নেবেন। বাংলাদেশে সায়েন্স গ্র্যাজুয়েটের কোন অভাব নেই। আমার এক ভাইস্তা আছে বি.এসসি. পাস করে ঘুরছে, তাকেও নিতে পারেন।'

হেড মাস্টার সাহেব মুখ শুকনো করে বসে রইলেন। উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেব চা এবং কেক খাওয়ালেন। কোন কিছুই তাঁর মুখে রুচল না।

হেড মাস্টার সাহেব তদন্ত কমিটি তৈরির ব্যাপারটা অনেকদিন ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। ডিসট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার "অতি জরুরী" সিল মেরে চিঠি পাঠিয়েছেন। আর দেরি করা যায় না। হেড মাস্টার সাহেব জালালুদ্দিন সাহেবকে অফিসে ডেকে পাঠালেন। সরু গলায় বললেন, জালাল সাহেব, আপনাকে তো একটা অপ্রিয় দায়িত্ব পালন করতে হয়। একটা তদন্ত কমিটি হচ্ছে, আপনি তার চেয়ারম্যান, তিনজন মেম্বার। আফজাল সাহেব, সেক্রেটারি সাহেব, এবং উপজেলা চেয়ারম্যান। আমাদের মধ্যে আপনি সবচে' বয়োজ্যেষ্ঠ এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি -- সেই হিসেবে আপনি চেয়ারম্যান।

জালাল সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, কিসের তদন্ত?

হেড মাস্টার সাহেব গলা পরিষ্কার করতে করতে বললেন, কেলেংকারি ব্যাপার হয়েছে। স্পেশাল পারমিশনে নীলগঞ্জ স্কুলকে একশ বস্তা গম দেয়া হয়েছিল। মবিনুর রহমান সইসাবুদ করে গম নিয়েছে। আমাকে বলেছে দশ বস্তা। আমি তো তাই সরল মনে বিশ্বাস করলাম। মবিনকে অবিশ্বাস করার কি কোন কারণ আছে? আপনি বলেন। যাই হোক, দু'মাস পর ডিও-র চিঠি পেয়ে আমি তো যাকে বলে থাণ্ডারস্ট্রাক, বজ্রাহত।

জালালুদ্দিন হতভম্ব গলায় বললেন, মবিন এই কাজ করেছে আমার বিশ্বাস হয় না। যদি আসমান থেকে ফেরেশতা নেমে এসে বলে — 'মবিন গম চুরি করেছে।' আমি বিশ্বাস করব না।

'বিশ্বাস তো আমিও করি না। করি না বলেই তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান করলাম আপনাকে। আপনি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মবিনকে আজই কিছু বলার দরকার নেই . . . '

'আমার তো মনে হয় আজই কথা বলা দরকার।'

'দরকার মনে হলে বলবেন — আপনি হচ্ছেন তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান। আপনি যা ডিসাইড করবেন তাই হবে। থরো ইনকোয়ারি হবে।'

'আমি কিছুই বুঝছি না। কিছুই না — এমন একজন ভাল মানুষ।'

'ভাল মানুষ, মন্দ মানুষ চট করে চেনা যায় না জালাল সাহেব। চট করে মানুষ চেনা গেলে কি আর দুনিয়ার আজ এই হালত? তবে আপনাকে একটা কথা বলি, গোড়া থেকেই কিন্তু এই লোকটাকে আমার পছন্দ না। তারপর যখন দু'মাস আগে নৌকা কিনে ফেলেছে — দুই না তিন হাজার টাকা দাম। নৌকা ঘাটে বাঁধা থাকে তখনো মনে খচ করে উঠল।'

জালাল সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। হেড মাস্টার সাহেবের কথা শুনতে তাঁর এখন আর ভাল লাগছে না। টির্চাস কমনরুমে মবিনুর রহমানকে পেলেন না। দীর্ঘদিন পর এই মানুষটা স্কুল কামাই করেছে এবং বেছে বেছে আজকের দিনে। এটা কি পুরোপুরি কোন কাকতালীয় ব্যাপার? জালাল সাহেব ক্লাস সিক্সে ধর্ম পড়াতে পড়াতে হঠাৎ বললেন, সুরা বনি ইসরাইলে দু'টা চমৎকার বাক্য আছে — "মানুষ যেভাবে ভাল চায়, সেভাবেই মন্দ চায়। মানুষের বড়ই তাড়াহুড়া।" তোমরা এই দুই লাইনের ব্যাখ্যা কর। তোমাদের যা মনে আসে তাই লেখ। আর শোন, কেউ হৈ চৈ করবে না। আমার মন আজ ভাল না। মন অসম্ভব খারাপ। বলতে বলতে জালাল সাহেবের চোখে পানি এসে গেল।

ক'দিন ধরে রোজ বিকেলে আকাশ অন্ধকার করে মেঘ করছে। আজ ব্যতিক্রম। সারাদিন আকাশ ছিল ঘন নীল। মেঘের ছিটাফোঁটাও ছিল না। এখন সাড়ে ছ'টার মত বাজে, এখনো আকাশ পরিষ্কার। গাছের মাথায় মাথায় ঝকঝকে রোদ।

রূপা এই সময় তার মা'র ঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। জানালায় পর্দা দেয়া। পর্দা দেয়া থাকলেও পর্দার ফাঁক দিয়ে অনেক দূর দেখা যায়। ঠিক সাড়ে ছ'টায় রূপার মাস্টার সাহেব তাদের বাড়ির গেটে হাত রাখেন। হাত রাখার আগে পকেট থেকে ঘড়ি বের করে বিরক্ত চোখে তাকান। এই দৃশ্য দেখতে রূপার বড় ভাল লাগে।

তার কি যে হয়েছে। রোজ দুপুরের পর থেকেই এক ধরনের অস্বস্তি। অস্বস্তির সঙ্গে সঙ্গে আশংকা : যদি না আসেন। যতই বিকেল হতে থাকে আশংকা ততই বাড়তে থাকে। এক সময় বুকের ভেতর ধুকধুক শব্দ এত বেশি হয় যে মনে হয় সবাই শুনে ফেলছে। সাড়ে ছ'টার পর অবধারিতভাবে এই শব্দ কমে যায়। নিজেকে তখন খুব ক্লান্ত লাগে। সারাদিন খুব পরিশ্রমের কোন কাজ করলে কাজের শেষে যে রকম ক্লান্তি অনেকটা সে রকম ক্লান্তি।

এই যে ব্যাপারগুলি তার মধ্যে হচ্ছে এটা কি অন্যায়? অন্যায় তো বটেই, তবে খুব বেশি অন্যায় নিশ্চয়ই না। সে তেমন কিছু তো করে না। স্যার যা পড়তে বলেন পড়ে। যে অংক করতে বলেন করে। বাড়ির কাজ করে। মাঝে মাঝে অবশ্যি সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায় — তখন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। এই সময় শরীরে এক ধরনের ব্যথা বোধ হয়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। বমি বমি ভাব হয়। তখন সামনে থেকে উঠে গিয়ে বমি করতে হয়। তবে এই ব্যাপারগুলি ঘনঘন হয় না। ঘনঘন হলে সবার চোখে পড়ত। ভাগ্যিস কিছুদিন পর পর হয়।

রূপা তার স্যারকে গত ছ'মাসে গভীর মনোযোগে লক্ষ্য করেছে। এত মনোযোগ দিয়ে এর আগে সে কাউকেই লক্ষ্য করেনি। ভবিষ্যতেও করবে না। কারণ করার প্রয়োজন নেই। রূপার ধারণা এই মানুষটিকে সে যতটা ভাল জানে অন্য কেউ তা জানে না, এমন কি মানুষটা নিজেও এতটা জানেন না।

মানুষটা কি জানেন যে তিনি মাঝে মাঝে অসম্ভব অন্যমনস্ক হয়ে যান? হঁ্যা, তা নিশ্চয়ই জানেন। তবে অন্যমনস্ক হবার আগ মুহূর্তে তিনি কি করেন তা-কি জানেন? না, জানেন না। এটা জানে শুধু রূপা। এই মানুষটা যখন বাঁ হাত দিয়ে খুব শান্ত ভঙ্গিতে মাথার চুল ভাঁজ করতে থাকেন তখন বোঝা যাবে তিনি অন্যমনস্ক হতে শুরু করেছেন। অন্যমনস্ক অবস্থায় মানুষটা কি ভাবেন তা রূপার খুব জানার ইচ্ছা। রোজই ভাবে জিজ্ঞেস করবে। জিজ্ঞেস করা হয় না। শেষ মুহূর্তে লজ্জা লাগে। তবে একদিন সে নিশ্চয় জিজ্ঞেস করবে। হয়ত আজই করবে।

মানুষটা রূপাকে খুবই বাচ্চা মেয়ে বলে মনে করেন এটা যেমন সত্যি তেমনি এটাও সত্যি রূপা যখন কিছু বলে তখন তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে শুনেন এবং রূপার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করেন। রূপা প্রচুর মিথ্যা কথা বলে। খুব যে গুছিয়ে মিথ্যা বলে তাও না, অথচ মানুষটা তা বিশ্বাস করেন। রূপার তখন খুব খারাপ লাগে।

একবার রূপা বলল, মশা যে খুব বুদ্ধিমান প্রাণী তা কি স্যার আপনি জানেন?

তিনি অবাক হয়ে বললেন, জানি না তো। খুব বুদ্ধিমান হবার তো কথা না। ক্ষুদ্র প্রাণীর মস্তিষ্কের পরিমাণ অতি অল্প।

'স্যার মস্তিস্ক অল্প হলেও মশা খুব বুদ্ধিমান। আমি পরীক্ষা করে বের করেছি।'

মানুষটা এতে খুব উৎসাহিত বোধ করলেন। তাঁর চোখ চকচক করতে লাগল। মাথা সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে এল, আবেগশূন্য কণ্ঠস্বরেও খানিকটা আবেগ চলে এল। তিনি ছেলেমানুষি কৌতূহল নিয়ে বললেন, কি পরীক্ষা?

রূপার লজ্জা লাগছে। কারণ এখন সে যা বলবে তার পুরোটাই ডাহা মিথ্যা। অনেক ভেবেচিন্তে বের করেছে।

'পরীক্ষাটা করেছি আমার মামাতো বোনকে দিয়ে। মামাতো বোনের নাম ইয়াসমিন। আমার দুই বছরের ছোট। সে মশারী খাটিয়ে ঘুমুতে পারে না, তার নাকি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। আমি একদিন লক্ষ্য করলাম, যখন সে জেগে থাকে তখন মশা খুব কম কামড়ায়। যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন খুব বেশি কামড়ায়। বুদ্ধিমান বলেই তারা অপেক্ষা করে কখন মানুষটা ঘুমিয়ে পড়বে। আরাম করে রক্ত খাওয়া যাবে। ঠিক না স্যার?'

'বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এমন হেলাফেলা করে হয় না রূপা। আরো সূক্ষ্মভাবে করতে হয়। যেমন ধর, ঘুমুবার আগে ঘণ্টায় ক'টা মশা কামড়াচ্ছে। ঘুমুবার পর ক'টা। একজনকে দিয়ে পরীক্ষা করলেও হবে না। অনেককে দিয়ে করতে হবে। বুঝতে পারছ কি বলছি?'

'জ্বি স্যার।'

'তবে তোমার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে বুঝতে হবে মশার মনে মৃত্যুভয় আছে। মৃত্যুভয় আছে বলেই জাগ্রত মানুষকে কামড়াচ্ছে না। মৃত্যুভয় বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ। শুধুমাত্র নির্বোধদেরই মৃত্যুভয় থাকে না।'

'স্যার আমার কিন্তু মৃত্যুভয় নেই। আমি কি নির্বোধ?'

'এইসব কথা এখন থাক। ফিজিক্স বইটা খুল তো।'

'ফিজিক্স পড়তে আমার ভাল লাগে না, স্যার।'

'ফিজিক্স পড়তে ভাল লাগে না? তুমি এইসব কি বলছ? খুবই অন্যায় কথা বলছ। তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।'

রূপা বিস্মিত হয়ে বলল, কার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব?

'তোমার নিজের কাছে।'

'আচ্ছা স্যার ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। এবং নিজেকে নিজে ক্ষমা করে দিলাম।'

'বই খোল, থার্ড চেপ্টার বের কর — স্থির বিদ্যুৎ।'

রূপা নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে থার্ড চেপ্টার বের করল। মানুষটা হাত নেড়ে নেড়ে স্থির বিদ্যুৎ বুঝাচ্ছেন। এমনভাবে বুঝাচ্ছেন যেন স্থির বিদ্যুৎ তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। রূপা পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে। আবার বমি বমি লাগছে। মাথা ঘুরছে। কেন এ রকম হয়? তার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? কি আছে এই মানুষটার মধ্যে, কেন তাকে এত ভাল লাগে?

ছ'টা চল্লিশ বাজে।

এখনো মানুষটার দেখা নেই। আকাশ পরিষ্কার। ঝড়-বৃষ্টি কিছুই নেই। এ রকম তো হবার কথা নয়। রূপার কেমন যেন লাগছে। গা কাঁপছে, ঘাম হচ্ছে। মাথার

ভেতরটা যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। রূপা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তাদের উঠোনে অনেক গাছপালা। গাছপালার জন্যেই রাস্তা দেখা যায় না। রূপার মনে হল গেটের কাছে দাঁড়ালেই সে দেখবে লম্বা মানুষটা মাথা নিচু করে দ্রুত আসছেন। দেরি করার জন্যে রূপা আজ কিছু কঠিন কথা শুনাবে। অবশ্যই শুনাবে। ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই আজ দেরি করবেন কেন?

রূপা গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে ডিসট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার অনেকখানিই দেখা যায়। রাস্তায় লোকজন আছে কিন্তু ঐ মানুষটা নেই। রূপার মনে হল খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে তারপর যখন সে তাকাবে তখনই মানুষটাকে দেখতে পাবে । অবশ্যই পাবে। সে দীর্ঘ সময় চোখ বন্ধ করে রইল, এক সময় চোখ মেলল। রাস্তা ফাঁকা, কেউ নেই।

সন্ধ্যা মিলাচ্ছে, আকাশ গাঢ় রক্তবর্ণ। রূপা এখনো গেটের বাইরে। রূপার মা এক সময় বারান্দায় এসে বিস্মিত গলায় বললেন, ভরসন্ধ্যায় বাইরে কেন রে মা?

রূপা জবাব দিল না।

'আয়, ঘরে আয়।'

রূপা ঘরে ঢুকলো। রূপার মা বললেন, তোর কি হয়েছে? তোকে এমন লাগছে কেন? চোখ লাল।

রূপা ক্লান্ত গলায় বলল, মনে হয় আমার জ্বর আসছে।

'কই গা তো ঠাণ্ডা।'

'শরীরটা ভাল লাগছে না মা।'

'যা শুয়ে থাক।'

'আচ্ছা। স্যার এলে বলবে, আজ আমি পড়ব না।'

'বলব।'

রূপা ঘর অন্ধকার করে শুয়ে রইল। তার প্রতি মুহূর্তেই মনে হতে লাগল — এই বুঝি স্যার এসেছেন।

স্যার এলেন না, তবে রাত দশটায় রূপার বড় ভাই রফিক তার স্ত্রী এবং দুই কন্যা নিয়ে খুলনা থেকে বিনা নোটিসে এসে উপস্থিত হল। সে তিন বছর পর গ্রামের বাড়িতে এসেছে। তার দ্বিতীয় মেয়ে রুবাবাকে এবাড়ির কেউ দেখেনি। সেই মেয়ে এখন ফড়ফড় করে কথা বলে। যা দেখছে সে দিকেই ডান হাতের পাঁচ আঙুল বাড়িয়ে বলছে, এটা কি? বড় মেয়ের নাম জেবা। এই মেয়ে নিঃশব্দবতী, তার মুখে কোন কথা নেই। রূপা এখন পর্যন্ত তার মুখ থেকে একটি কথাও শুনেনি। বাড়িতে আনন্দের সীমা নেই। রূপার মা ছেলেকে এবং ছেলের বৌকে জড়িয়ে ধরে ক্রমাগত কাঁদছেন। রূপারও অসম্ভব ভাল

লাগছে। সে ভাইয়ের ছোট মেয়েকে কোলে নিয়ে বাগানে হাঁটছে। মেয়েটি এক সময় আকাশের চাঁদের দিকে হাতের পাঁচ আঙুল মেলে বলল, এটা কি?

রূপা বলল, এটা চাঁদ। পূর্ণিমার চাঁদ। তোমাদের খুলনার পচামার্কা চাঁদ না। আমাদের ময়মনসিংহের চাঁদ। দেখেছ কত সুন্দর?

কয়েকটা জোনাকি উড়ে গেল। রুবাবা বলল, এটা কি?

'এর নাম জোনাকি। এরা চাঁদের কণা গায়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কি সুন্দর তাই না রুবাবা?'

একটা বাদুর উড়ে যাচ্ছিল। রুবাবা বলল, এটা কি?

রফিক এক সময় বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তার পেছনে পেছনে বাড়ির সবাই। রফিক তার মা'কে বলল, রূপা তো মা পরীর মত সুন্দর হয়েছে। আশ্চর্য।

ভাইয়ের কথা শুনে রূপার চোখে কেন জানি পানি এসে গেল।

রফিক বলল, এই রূপা অন্ধকারে বাগানে ঘুরছিস? সাপখোপ আছে না?

রূপা হালকা গলায় বলল, অন্ধকার কোথায়? দেখছ না কত বড় চাঁদ। দিনের মত আলো।

রূপার বাবা বাড়িতে নেই। মামলার ব্যাপারে নেত্রকোনা গিয়েছেন। কয়েকদিন সেখানে থাকবেন। তাঁকে খবর দেবার জন্য রাতেই লোক গেল। একজন গেল ঘাটে। মাছ কিনতে।

ঘাটে বড় বড় মাছ পাওয়া যায়। বেপারীরা ঢাকায় চালান দেবার জন্যে কিনে এনে জড় করে।

মবিনুর রহমান নৌকার ছাদে বসে আছেন। নদীতে জোছনা যেন গলে গলে পড়ছে। পৃথিবী তাঁর কাছে এত সুন্দর এর আগে কখনো মনে হয়নি। এই ব্যাপারটাও তাঁর কাছে অস্বাভাবিক লাগছে। পৃথিবীর সৌন্দর্য নিয়ে তাঁর কোন মাথাব্যথা ছিল না। তিনি কবি নন। বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। প্রকৃতির সৌন্দর্যের চেয়ে প্রকৃতির নিয়ম-নীতির সৌন্দর্য তাঁকে অনেক বেশি আকর্ষণ করে। আজ সারাদিন তিনি কিছু খান নি। কারণ ঘরে কোন খাবার নেই। সব এক সঙ্গে শেষ হয়েছে। হরলিক্সের একটা কৌটায় চিড়া ছিল। মুখ খুলে দেখা গেল পোকা পড়ে গেছে। ডালের টিনে ডাল আছে। দুপুরে একমুঠ ডাল চিবিয়ে খেলেন। নাড়ীভুঁড়ি উল্টে আসার জোগাড় হল। বিকেল পর্যন্ত তিনি ক্ষিধেয় কষ্ট পেয়েছেন। এখন আর পাচ্ছেন না। বরং এখন মনে হচ্ছে পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখতে হয় ক্ষুধার্ত অবস্থায়। ক্ষুধার্ত মানুষের স্নায়ু থাকে তীক্ষ্ণ। আহারে পরিতৃপ্ত একজন মানুষ ভোতা স্নায়ু নিয়ে তেমন কিছু বুঝে না।

রাত ন'টার দিকে জালালুদ্দিন এসে উপস্থিত হলেন।

ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে অনেক ডাকাডাকি করলেন। কেউ সাড়া দিল না। সাপের ভয়ে তিনি ঘরে ঢুকলেন না। নদীর দিকে রওনা হলেন। ঘরে যখন নেই। নৌকায় থাকতে পারে। না–কি সাপের কামড়ে ঘরে মরে পড়ে আছে?

দূর থেকে জালালুদ্দিনের মনে হল নৌকার উপর একটা পাথরের মূর্তি বসে আছে। জীবন্ত মানুষ এইভাবে বসে থাকতে পারে না। সামান্য হলেও নড়াচড়া করে। জালালুদ্দিন ডাকলেন, মবিন, এই মবিন।

পাথরের মূর্তি ডাক শুনতে পেল না। জালালুদ্দিনের কেন জানি মনে হচ্ছিল শুনতে পাবে না। চিৎকার করে ডাকলেও এই মানুষ কিছু শুনবে না। গায়ে ঝাঁকি দিয়ে তাকে জাগাতে হবে।

তিনি নৌকায় উঠে এলেন।

মবিনুর রহমান চমকে উঠে বললেন, আপনি।

'স্কুলে যাও নাই, খোঁজ নিতে আসলাম। করছ কি?'

'জ্যোৎস্না দেখছি।'

'কবি–সাহিত্যিকরা জ্যোৎস্না দেখে বলে শুনি — তুমি হলে গিয়ে সায়েন্সের লোক। আজ স্কুলে যাও নাই কেন? শরীর ভাল আছে?'

'জ্বি — শরীর ভালই আছে।'

'শরীর ভাল তো স্কুলে যাও নাই কেন? সারাদিন করেছ কি? ঘরে বসে ছিলে?'

'জ্বি–না। নৌকায় ছিলাম। কিছু করছিলাম না — এই দৃশ্য–টৃশ্য দেখছিলাম।'

'কি দৃশ্য দেখছিলে?'

'সন্ধ্যাবেলা কয়েক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল। দেখতে খুব ভাল লাগল। পাখির ঝাঁকে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস লক্ষ্য করলাম। সব ঝাঁকে পাখি থাকে বেজোড় সংখ্যা।'

'এর মধ্যে ইন্টারেস্টিং কি?'

'খুবই ইন্টারেস্টিং। পাখিদের নিয়ম হচ্ছে এরা সব সময় জোড়ায় জোড়ায় থাকে। একটা পুরুষ পাখির সঙ্গে একটা মেয়ে পাখি থাকবেই। কিন্তু ঝাঁকগুলায় একটা পাখি আছে সঙ্গীহীন। এর কারণটা কি? আর এই নিঃসঙ্গ পাখিটা পুরুষ না মেয়ে এটাও আমার জানার ইচ্ছা। কিভাবে সম্ভব হবে বুঝতে পারছি না। কিভাবে এটা বের করা যায় বলুন তো?'

জালালুদ্দিন কিছু বললেন না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। এই মানুষটিকে তিনি আট বছর ধরে চেনেন। তবু মনে হচ্ছে আট বছরে ঠিকমত চেনা হয়নি।

'মবিন!'

'জ্বি।'

'ইয়ে একটা কাজে তোমার কাছে এসেছিলাম।'

'কি কাজ?'

'ফুড ফর ওয়ার্ক প্রোগ্রামে তুমি একবার কিছু গম এনেছিলে মনে আছে?'

'হ্যাঁ — মনে আছে।'

'কয় বস্তা গম ছিল?'

'দশ বস্তা।'

'তোমার পরিষ্কার মনে আছে তো?'

'মনে থাকবে না কেন? আমি নিজে সই করে আনলাম।'

'দশ বস্তাই ছিল? এর বেশি না?'

'বেশি থাকবে কেন? অবশ্যি বস্তা আমি গুনি নাই। হেডস্যার গুনলেন। আমি শুধু সই করে দিয়েছি।'

'হেড স্যার বস্তা গুনেছিলেন?'

'এইসব জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'এম্নি। এম্নি জিজ্ঞেস করছি। তোমার ঘরে কি চায়ের ব্যবস্থা আছে?'

'না, আমি তো চা খাই না।'

'চায়ের একটা বাজে নেশা হয়েছে। বিকালে চা না খেলে ভাল লাগে না। আচ্ছা আসছি যখন তোমার চোঙটা দিয়ে আকাশ দেখে যাই। শনির বলয় দেখা যাবে না?'

'আজ দেখা যাবে না। চাঁদের আলো খুব বেশি।'

'তাহলে থাক। নৌকায় বসে থাকতে তো ভালই লাগছে। বড়ই সৌন্দর্য। কোরান মজিদে আল্লাহপাক কি বলেছেন জান? সূরা কাহাফ্–এর সপ্তম পারায় আছে — "পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেগুলিকে তার শোভা করেছি।" 'এই অর্থ ধরলে চন্দ্র হচ্ছে পৃথিবীর শোভা। কি, ঠিক না?'

মবিনুর রহমান জবাব দিলেন না। তার মাথায় চমৎকার একটা চিন্তা এসেছে। যদি পৃথিবীর আহ্নিক গতি না থাকতো তাহলে পৃথিবীর একদিকে থাকতো সূর্যের আলো, অন্যদিকে চির অন্ধকার। তখন যদি চাঁদটার অবস্থান এমন হত যে, চির–অন্ধকার পৃথিবীতে থাকবে চির–জ্যোৎস্না — তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াতো? সেই চির–জ্যোৎস্নার জগতের গাছপালাগুলি নিশ্চয়ই অন্যরকম হত। মানুষগুলিও হত অন্যরকম। সেই অন্যরকমটা কি রকম?

জালালুদ্দিন ডাকলেন, মবিন!

মবিন জবাব দিলেন না। তাঁর সমস্ত চিন্তা–চেতনায় আছে চির–জ্যোৎস্নার দেশ। ঠিক এই রকম অবস্থায় মবিনুর রহমান দ্বিতীয় স্বপ্নটা দেখলেন। এই স্বপ্ন জাগ্রত

অবস্থায় ঘোরের মধ্যে দেখা। কাজেই তাকে হয়ত স্বপ্ন বলা যাবে না। মবিনুর রহমান স্পষ্ট দেখলেন — অসংখ্য বুড়ো মানুষ তাঁর দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে। তারা এক সঙ্গে বলে উঠল — হচ্ছে, তোমার হচ্ছে। তুমি একজন প্রথম শ্রেণীর 'নি'। তুমি তোমার প্রচণ্ড ক্ষমতা ব্যবহার কর।

'মবিন ! এই মবিন !'

'জ্বি।'

'কি হচ্ছে তোমার, এই রকম করছ কেন?'

'কি করছি?'

'গোঁ গোঁ শব্দ করছিলে।'

মবিনুর রহমান ক্লান্ত গলায় বললেন, স্বপ্ন দেখছিলাম।

'স্বপ্ন দেখছিলে মানে? তুমি ঘুমুচ্ছিলে না-কি?'

মবিনুর রহমান বিব্রত গলায় বললেন, ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।



রূপার বড় ভাই রফিক খুব আমোদে মানুষ। হৈচৈ করতে পছন্দ করে। লোকজন জড়ো করে আড্ডা দেয়ায় তার খুব আগ্রহ। সে আসার পর থেকে রূপাদের বাড়িতে প্রচুর লোকজন। আসছে, যাচ্ছে, চা খাচ্ছে। বড় চায়ের কেতলী চুলায় আছেই।

বাড়ি-ভর্তি মানুষ, কিন্তু রূপার অস্থিরতা কমছে না। সে খুব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে, পারছে না। মনে হচ্ছে এ জীবনে আর কোনদিনও সে স্বাভাবিক হতে পারবে না। রফিকের এক গল্প শুনে সে খুব শব্দ করে হাসল। রফিক বিস্মিত হয়ে বলল, হাসছিস কেন?

রূপা ক্ষীণ গলায় বলল, হাসির গল্প তাই হাসলাম।

'আমি তো মোটেই হাসির গল্প বলিনি। আমাদের এক কলিগের স্ত্রী কিভাবে এ্যাক্সিডেন্ট করে পঙ্গু হয়ে গেছে, সই গল্প করলাম। এর মধ্যে হাসির তো কিছু নেই।'

রূপা চুপ করে রইল। ভাইয়ার দিকে চোখ তুলে তাকাতেও এখন তার ভয় ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে ভাইয়ার দিকে তাকালেই সে সব কিছু বুঝে ফেলবে।

'রূপা !'

'জ্বি।'

'তোর কি হয়েছে বল্ তো?'

'কিছু হয়নি।'

'আমার তো মনে হয় কিছু-একটা হয়েছে। তুই কারো কথাই মন দিয়ে শুনছিস না। তোর মধ্যে একটা ছটফটানি ভাব চলে এসেছে। আগে তো তুই এমন ছিলি না।'

'মানুষতো বদলায় ভাইয়া।'

'অবশ্যই বদলায় — এমনভাবে বদলায় না। তুই মাকে ডেকে আনতো, মাকে জিজ্ঞেস করি।'

'তাকে জিজ্ঞেস করার কি আছে?'

'ডেকে আনতে বলছি, ডেকে আন।'

রূপা মাকে ডেকে নিয়ে এল। নিজে সামনে থাকল না। থাকতে ইচ্ছা করল না। সে লক্ষ্য করেছে তাকে নিয়ে বাড়িতে ঘনঘন বৈঠক হচ্ছে। বৈঠকে এমন কিছু আলোচনা

হচ্ছে যেখানে তার উপস্থিতি কাম্য নয়। সবাই নিচু গলায় কথা বলছে — সে কাছে এলেই থেমে যাচ্ছে। এর মানে কি?

রূপা বাগানে নেমে গেল। সাতটা বাজতে বেশি বাকি নেই। রূপা নিশ্চিত আজ স্যার আসবেনই। আজ ছ'তারিখ। ছ'তারিখ তার জন্যে খুব লাকি। ক্লাস এইটে বৃত্তি পাবার খবর সে পেয়েছিল ছ'তারিখে। মবিনুর রহমান স্যার প্রথম এ বাড়িতে এসেছিলেনও ছ'তারিখে। রূপা লক্ষ্য করল ভাইয়া মা'র সঙ্গে কথা বলছে এবং আড়চোখে তাকে দেখছে। রূপা এমন ভাব করলো যেন সে বাগানের গাছগুলি দেখছে। যদিও গাছপালার প্রতি তার তেমন মমতা নেই।

বারান্দায় জেবা এসে দাঁড়িয়েছে। সে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রূপার দিকে। এই মেয়েটির চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু আছে যে অস্বস্তি বোধ হয়। মনে হয় এই মেয়েটার দু'টা চোখের ভেতরও কয়েকটা চোখ আছে। এক সঙ্গে অনেকগুলি চোখ যেন তাকে দেখে রূপা জেবার দিকে তাকিয়ে বলল, বাগান দেখবে জেবা?

জেবা হ্যাঁ-না কিছু বলল না, তবে বাগানে নেমে এল।

রূপা বলল, এই বাগানের নাম কি জান? জংলী বাগান। কোন যত্ন নেই — গাছপালায় জঙ্গল হয়ে আছে। তাই জংলী বাগান।

জেবা কিছু বলল না। এই মেয়েটা একেবারেই কথা বলে না।

'আমাদের এই জংলী বাগান তোমার কাছে কেমন লাগছে জেবা?'

জেবা নিশ্চুপ। যেন সে পণ করেছে কোন কথা বলবে না। রূপা হাসতে হাসতে বলল, তুমি কি কারো সঙ্গেই কথা বল না?

জেবা হাসল। ঠিক হাসিও না। তার ঠোঁট বাঁকাল না, তবে চোখে হাসি ঝিলিক খেলে গেল। সে এবারে স্পষ্ট গলায় বলল,

তুমি কার জন্য অপেক্ষা করছ ফুপু?

রূপা চমকে উঠে বলল, কারো জন্যে অপেক্ষা করছি নাতো। আমি কারো জন্যে অপেক্ষা করছি এটা তোমার মনে হল কেন?

জেবা এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বাগান থেকে উঠে বারান্দায় চলে গেল। রফিক হাসিমুখে বলল, কি মা বাগান ভাল লাগল না? জেবা জবাব দিল না। রফিক আবার বলল, আমাদের এই বাড়ি তোমার পছন্দ হয়েছে তো মা? জেবা এই প্রশ্নের উত্তরেও কিছু বলল না। তাকে আরো প্রশ্ন করা হতে পারে এই ভয়েই হয়ত-বা বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

রফিকের মা বললেন, তোর এই মেয়ে বোধহয় আমাদের কাউকে পছন্দ করছে না। কারো কোন কথার জবাব দেয় না। রফিক বলল, ও এ রকমই মা। কথা বলার

ইচ্ছা হলেই কথা বলবে। ইচ্ছা না হলে বলবে না। খুব সমস্যা করছে। ঢাকায় নিয়ে ডাক্তার দেখাব।

'ডাক্তার কি করবে?'

'সাইকিয়াট্রিস্ট, ওরা এইসব ব্যাপার জানে। বাচ্চারা থাকবে বাচ্চাদের মত। ওকে দেখ কেমন বড়দের মত ভঙ্গি করে ঘুরে। ওর কথা বাদ দাও মা। এখন রূপার ব্যাপারটা বল। ওর হয়েছে কি?'

'কিছু হয়নি তো।'

'আগেও তো বললে কিছু হয়নি। ভাল করে ভেবে বল ও কারো প্রেমে-ট্রেমে পড়েনি তো?'

'কি বলিস তুই।'

'আজগুবি কোন কথা বলছি না মা, রূপার ভাবভঙ্গি আমার ভাল লাগছে না বলেই বলছি। শেষটায় বিয়ে ঠিকঠাক হবার পর দেখা যাবে সে বেঁকে বসেছে।'

'এ রকম কিছু নাই।'

'জান তো ভালমতো?'

'জানি।'

'কিন্তু আমার ভাল লাগছে না । রূপাকে দেখ কেমন মূর্তির মত দেখাচ্ছে। আগে তো ও এরকম ছিল না।

রফিক ঘরের ভেতরে চলে গেল। ছোট মেয়ে রুবাবা তারস্বরে চিৎকার করছে। সে ছাড়া এই মেয়েকে কেউ সামলাতে পারে না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এত চিৎকারেও রূপার কোন ভাবান্তর নেই। যেন সে কিছু শুনছে না। এক ধরনের ঘোরের মধ্যে আছে।

রূপা সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত বাগানে বসে রইল। বাঁধানো বকুল গাছের নিচে বসার ব্যবস্থা আছে।

রফিক বাইরে বেরুতে গিয়ে এই দৃশ্য দেখে বিরক্ত গলায় বলল, এখনো বাগানে বসে আছিস কেন?

'মাথা ধরেছে ভাইয়া। ফ্রেশ বাতাস নিচ্ছি।'

'বর্ষার সময়, সাপখোপ বেরুবে। উঠে আয়।'

রূপা উঠে এলো। রফিক বিস্মিত হয়ে বলল, তুই কি কাঁদছিলি নাকি?

'কাঁদব কেন শুধু শুধু?'

'তোর গাল ভেজা, এই জন্যেই জিজ্ঞেস করছি।'

রূপা শাড়ির আঁচলে গাল মুছতে মুছতে বলল, 'হ্যাঁ কাঁদছিলাম। মাথার যন্ত্রণায় কাঁদছিলাম। মাঝে মাঝে এমন যন্ত্রণা হয়। মাথাটা কেটে ফেলে দিতে ইচ্ছা করে।

'সে কি। যন্ত্রণা খুব বেশি?

'হুঁ।'

'ডাক্তার দেখিয়েছিস?'

'না।'

'তোদের নিয়ে বড় যন্ত্রণা। অসুখ-বিসুখ হবে, ডাক্তার দেখাবি না? দেশে ডাক্তার আছে কি জন্যে? আচ্ছা, আমি বিধুবাবুকে নিয়ে আসব।'

'কাউকে আনতে হবে না।'

'যা ঘরে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাক। রাতে তোর সাথে আমার কিছু জরুরী কথা আছে।'

'এখন বল।'

'না এখন না। রাতে বলব। এখন একটা কাজে যাচ্ছি। আর শোন, তোর যদি বিশেষ কোন কথা বলার থাকে যা আমাকে বা মাকে বলতে লজ্জা পাচ্ছিস তাহলে তোর ভাবীকে বলবি।'

'আমার আবার বিশেষ কি কথা . . . '

'থাকতেও তো পারে। এই জন্যই বলছি ।'

রূপা নিজের ঘরে এসে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে রইল। তাঁর এখন সত্যি সত্যি মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। অসম্ভব কষ্টও হচ্ছে। আজ ছ'তারিখ, কিন্তু স্যার এলেন না । উনার কি কোন অসুখ-বিসুখ করেছে? মোতালেবকে কি পাঠাবে খোঁজ নিতে? যদি পাঠায় কেউ কি তা অন্য চোখে দেখবে? অন্য চোখে দেখার তো কিছু নেই। একটা লোকের অসুখ-বিসুখ হলে খোঁজ নিতে হবে না।

হারিকেন হাতে মিনু ঘরে ঢুকল। কোমল গলায় বলল, তোমার নাকি প্রচন্ড মাথা ব্যথা?

'হ্যাঁ, ভাবী ।'

'মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?'

'না, তুমি এখন যাও। আমার একা থাকতে ইচ্ছা করছে। কিছুক্ষণ একা থাকলে মাথা ধরাটা কমবে ।'

'এ রকম কি তোমার প্রায়ই হয়?'

'হুঁ।'

'মশারী খাটিয়ে শোও। মশা কামড়াচ্ছে তো।'

'মশা কামড়াচ্ছে না ভাবী, তুমি যাও, হারিকেন নিয়ে যাও — আলো চোখে লাগছে।'

মিনু হারিকেন নিয়ে চলে যেতে যেতে বলল, তোমার স্যার এসেছিলেন। উনাকে বলেছি আজ পড়তে পারবে না । তোমার মাথা ব্যথা । তাঁকে চলে যেতে বলেছি।

রূপা উঠে বসল। তার বুক ধকধক করছে। মনে হচ্ছে, সে নিজেকে সামলাতে পারবে না । সে কাঁপা গলায় বলল, ভাবী উনি কি চলে গেছেন?

'জানি না। বলেছিলাম তো চা খেয়ে তারপর যেতে। বসেছেন কি-না জানি না।'

'ভাবী প্লীজ, উনাকে একটু বসতে বল।'

'তোমার মাথা ব্যথা?'

'এখন কমেছে। অনেকখানি কমেছে, জরুরী কিছু পড়া আছে দেখে নি।'

'কাল আসতে বলি?'

'না ভাবী না।'

মিনু হারিকেন হাতে চলে গেল। রূপার অস্বাভাবিক আগ্রহ তাঁর চোখ এড়াল না। অবশ্যি সে এটাকে তেমন গুরুত্ব দিল না। এই বয়েসী মেয়েদের আচার-আচরণ কোন ধরাবাঁধা পথে চলে না। তাদের আগ্রহ ও অনাগ্রহ কোনটারই সাধারণত কোন ব্যাখ্যা থাকে না। এরা চলে সম্পূর্ণ নিজের খেয়ালে।

মবিন সাহেবের হাতে দু'দিনের পুরানো একটা খবরের কাগজ। তিনি গভীর মনোযোগে খবরের কাগজ পড়ছেন। যে অংশটি পড়ছেন সে অংশ কেউ মন দিয়ে পড়বে না। সংবাদ শিরোনাম সিরাজগঞ্জের ধানচাষীদের কীটনাশকের জন্যে আবেদন। ধানে পামরী পোকা ধরেছে। সেই পোকা বিনষ্ট করা আশু প্রয়োজন . ..... ইত্যাদি, ইত্যাদি। খবরটা দু'বার পড়বার পর তিনি এখন তৃতীয় বারের মত পড়ছেন। তাঁর ভুরু কুঁচকে আছে। তিনি অপেক্ষা করছেন চায়ের জন্য। অপরিচিত একজন মহিলা তাকে বলে গেছেন, বসুন চা খেয়ে যান। তিনি বসে আছেন। চা এখনো আসছে না। রূপার মাথাব্যথা। সে আজ পড়বে না শুনে তিনি খানিকটা স্বস্তি বোধ করছেন। কারণ তাঁর মন ভাল না, পড়াতে ইচ্ছা করছে না। শুধু মন না — শরীরটাও খারাপ। পর পর তিন রাত ঘুম হয়নি। দিনের বেলা ঘুমুতে চেষ্টা করেন, লাভ হয় না। খানিকটা ঝিমুনির মত আসে — খুটখাট শব্দে ঝিমুনি কেটে যায়। বাজারে এসেছিলেন ঘুমের ওষুধ কিনতে, ফেরার পথে ভাবলেন রূপার পড়াশোনার খোঁজ নিয়ে যাবেন। একজন শিক্ষক সব সময় যে পড়া দেখিয়ে দেবেন তা তো না। মাঝে মাঝে তার উপস্থিতিই যথেষ্ট।

মবিন সাহেব খবরের এই অংশ তৃতীয়বার পড়া শেষ করে দরজার দিকে তাকালেন। দশ-এগারো বছরের একটি বালিকা পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সে চেষ্টা করছে যেন তাকে দেখা না যায়। দেখা যাচ্ছেও না, তবে পর্দার ফাঁক দিয়ে তার উজ্জ্বল চোখ দেখা যাচ্ছে।

মবিন সাহেব বললেন, তুমি কে? মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি কেউ না।

এ উত্তর মবিন সাহেবের পছন্দ হল। মেয়েটা ভালই বলেছে সে কেউ না। হো আর ইউ? আই অ্যাম নোবডি। বাহ্ ভাল তো।

'তোমার নাম কি?'

'জেবা।'

'জবা? বাহ্ সুন্দর নাম!'

'জবা না জেবা।'

'ও আচ্ছা, জেবা। পর্দার আড়ালে কেন? কাছে আস গল্প করি।'

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে চলে গেল।

মবিন সাহেব খুশিই হলেন। মেয়েটি গল্প করার জন্যে এগিয়ে এলে সমস্যা হত। তিনি একেবারেই গল্প করতে পারেন না। তাছাড়া এই বয়েসী মেয়েরা কোন ধরনের গল্প শুনতে চায় তাও জানেন না। তিনি চতুর্থ বারের মত ধান গাছের পোকা বিষয়ে খবর পড়তে শুরু করলেন। কিছুতেই এটা মাথা থেকে সরাতে পারছেন না।

চা নিয়ে রূপা ঢুকল। শুধু চা না - এক বাটি মুড়ি। মুড়ির উপর তিনটা ভাজা শুকনা মরিচ।

'স্যার কেমন আছেন?'

'ভাল।'

'এতদিন আসেননি কেন?'

মবিন সাহেব জবাব দিলেন না। এতদিন কেন আসেননি এটা বলতে হলে এক গাদা কথা বলতে হবে। কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। রূপা চেষ্টা করছে খুব স্বাভাবিক থাকতে। তার আচার-আচরণে কিছুতেই যেন ধরা না পড়ে — যে সে এই মুহূর্তে এক ধরনের ঘোরের মধ্যে আছে। বিশ্বাস পর্যন্ত হচ্ছে না যে স্যার তার সামনে বসে আছেন। মানুষটার চেহারা এত সাধারণ কিন্তু এই সাধারণ চেহারা তার কাছে এত অসাধারণ লাগছে। মনে হচ্ছে তার একটা জীবন সে এই লোকটির দিকে তাকিয়েই কাটিয়ে দিতে পারবে। এক পলকের জন্যেও সে চোখের পাতা ফেলবে না।

'স্যার, আজ কিন্তু আমি পড়ব না।'

'আচ্ছা।'

'কাল থেকে সিরিয়াসলি পড়া শুরু করব।'

'আচ্ছা।'

'কাল আসবেন তো?'

'হুঁ।'

'চা খান স্যার। চা ঠাণ্ডা হচ্ছে।'

তিনি চায়ে চুমুক দিলেন। রূপা বলল, খুলনা থেকে আমার বড় ভাই এসেছেন। উনার দুই মেয়ে জেবা এবং রুবাবা। রুবাবা খুব অদ্ভুত নাম না স্যার?

'হুঁ।'

'এই নাম আগে শুনেছেন?'

'না।'

'আমার মেজো ভাই থাকেন চিটাগাং। উনিও বোধহয় আসবেন। তাঁকেও খবর দেয়া হয়েছে। সবাই মিলে একটা হৈচৈ-এর ব্যবস্থা হচ্ছে।'

মবিন সাহেব ডান হাতে মাথার চুল আঁচড়াবার মত ভঙ্গি করছেন। এই ভঙ্গি রূপার চেনা। এর অর্থ তিনি এখন অন্যমনস্ক। অন্য কিছু ভাবছেন।

'স্যার। স্যার!'

'হুঁ।'

'কি ভাবছেন স্যার?'

'না মানে তেমন কিছু না — খবরের কাগজে একটা খবর পড়ার পর থেকে খারাপ লাগছে। মন থেকে বিষয়টা তাড়াতে পারছি না। ধান ক্ষেতে পোকা লেগেছে। চাষীরা পোকা মারার জন্য কীটনাশক চাচ্ছে। আমার খুব খারাপ লাগছে।'

রূপা বিস্মিত হয়ে বলল, খারাপ লাগার কি আছে?

মবিনুর রহমান চেয়ারে পা তুলে বসলেন। এই ভঙ্গিটাও রূপার চেনা। এখন তিনি কঠিন গলায় কিছু কথা বলবেন। তিনি কথা বলা শুরু করলেন।

শোন রূপা, এই পৃথিবীতে অসংখ্য প্রজাতির জন্ম হয়েছে। মানুষ যেমন একটি প্রজাতি, কীট-পতঙ্গও প্রজাতি। এদের সবার বেঁচে থাকার অধিকার আছে। এদের সঙ্গে সহাবস্থানের পদ্ধতি বের করা যেতে পারে, এদের হত্যা করা যাবে না। এদের হত্যা করার আমাদের কোন অধিকার নেই। আমরা সীমা লংঘন করছি।

রূপার খুব ইচ্ছে করল বলে — 'ওদের হত্যা না করলে তো এরা ধান খেয়ে ফেলবে। তখন আমরা মারা পড়ব।' কিন্তু সে কিছু বলল না। তাকিয়ে রইল। তার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। কথা শুনতে ইচ্ছা করছে। তার চেয়েও যা ভয়ংকর তার ইচ্ছা করছে এই মানুষটাকে একটু ছুঁয়ে দেখতে।

'যাই রূপা!'

'স্যার একটু বসুন। একটু।'

মবিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন?

'আরেক কাপ চা খান, আমি বানিয়ে নিয়ে আসি।'

'চা তো একবার খেলাম।'

'ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। আমি ভাল করে এক কাপ বানিয়ে নিয়ে আসি।'

'না।'

তিনি উঠে পড়লেন। রূপার খুব কষ্ট হচ্ছে। তার ইচ্ছে করছে হাত ধরে জোর করে তাঁকে বসিয়ে দিয়ে কঠিন গলায় বলে আপনাকে বসতেই হবে। আপনি যেতে পারবেন না। আপনি সারারাত এই চেয়ারে বসে থাকবেন। সারারাত আমার সঙ্গে গল্প করবেন।

তা বলা হল না। কল্পনা এক জিনিস। বাস্তব অন্য। বাস্তবে রূপা তার স্যারকে এগিয়ে দিল গেট পর্যন্ত। স্যার চলে যাবার পরেও গেট ধরে দাঁড়িয়ে রইল। আকাশ পরিষ্কার, চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় চারদিক ঝলমল করছে। এতো সুন্দর! পৃথিবী এতো সুন্দর!

রাতের খাবার শেষ হবার পর রফিক বলল, রূপা আয়, ছাদে বসে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করি। ছাদ পরিষ্কার?

'হুঁ। পাটি দিতে বলব? না চেয়ার?'

'পাটি দিতে বল। আর কয়েকটা বালিশ। তোর ভাবীকেও আসতে বল। ছাদে বসে চা খেতে খেতে জোছনা দেখি। অসম্ভব সুন্দর জোছনা হয়েছে। অনেকদিন এমন জোছনা দেখিনি।'

'তোমাদের খুলনায় জ্যোৎস্না হয় না?'

'হয়। দেখা হয় না। পানের বাটা সঙ্গে নিয়ে আসিস, পান খাব। কাঁচা সুপারি দিয়ে পান।'

ভাইয়া তাকে কি বলবে তা রূপা আঁচ করতে পারছে। বিয়ের কথা বলবে। এটা বলার জন্যে এত ভনিতা কেন কে জানে। বলে ফেললেই হয়। অনেকক্ষণ ধরেই তারা ছাদে বসে আছে। রফিক নানান কথা বলছে। মূল প্রসঙ্গে আসছে না। এক সময় রূপার ধারণা হল হয়ত মূল প্রসঙ্গ নেই। হালকা গল্পগুজব করার জন্যেই তাকে ডাকা হয়েছে। মিনু বালিশে মাথা রেখে শুয়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে কি-না বোঝা যাচ্ছে না।

রফিক বলল, মিনু ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি?

মিনু সাড়া-শব্দ করল না। রফিক হালকা গলায় বলল, রূপা তোর ভাবীর কাণ্ড দেখেছিস? ঘুম দিচ্ছে। এমন চমৎকার জোছনায় ঘুমিয়ে যাওয়া তো রীতিমত ক্রাইম। শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

রূপা বলল, আমার নিজেরও ঘুম পাচ্ছে ভাইয়া। কয়েকবার হাই তুলেছি। রফিক বলল, সবাই যদি ঘুমে কাতর হয়ে থাকে তাহলে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেই হয়। চল যাই, ফেয়ারওয়েল টু দা মুন।

'তুমি কি যেন বলবে বলছিলে।'

'তেমন জরুরী কিছু না। ইট কেন ওয়েট। তোর বিয়ের ব্যাপারে কথা বলব বলে ভাবছিলাম।'

'ও।'

'খুব ভাল ছেলে পাওয়া গেছে। সবদিক মিলিয়ে ছেলে জোগাড় করা তো এখন ভয়াবহ সমস্যা। ছেলে দেখতে সুন্দর হলে স্বভাব-চরিত্র হয় মন্দ। টাকা-পয়সা থাকলে বিদ্যা-বুদ্ধি থাকে না। ভাল ছেলে হলে দেখা যায় বোকা ছেলে, মন্দ হবার মত বুদ্ধি নেই বলে ভাল ছেলে হয়ে দিন পার করছে। তাছাড়া ভাল ছেলের কনসেপ্টও পাল্টে গেছে।'

'যাকে পেয়েছ সে-কি সব দিকে পারফেক্ট?'

'এখন পর্যন্ত তো তাই মনে হচ্ছে। তুই নিজে দেখ।'

'আমি নিজে কিভাবে দেখব?'

'ছেলেটাকে এখানে আসতে বলেছি। জহির চিটাগাং থেকে আসার সময় তাকে নিয়ে আসবে।'

'ও।'

'মনে হচ্ছে খুব উৎসাহ বোধ করছিস না।'

রূপা কিছু বলল না। রফিক সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, ছেলেটাকে আমি দেখেছি। কথা বলেছি। আমার কাছে খুবই ভাল লেগেছে। চমৎকার ছেলে।

'চমৎকার একটা ছেলে আমার মত একটা গ্রামের মেয়েকে বিয়ে করবে কেন?'

'বিয়ে করবে কারণ তুইও চমৎকার একটা মেয়ে। ছেলেটা এখানে আসছে। তোর লজ্জায় লজ্জাবতী হয়ে থাকার কোন কারণ নেই। তোরা কথাবার্তা বলবি। গল্প করবি। ছেলেটাকে গ্রাম দেখাবি এতে দোষের কিছু নেই। বুঝতে পারছিস্ আমার কথা?

'পারছি।'

'কিছু বলবি?'

'ভাইয়া, ধর আমার ছেলেটাকে পছন্দ হল। ছেলেটার আমাকে পছন্দ হল না। তখন?'

'তখন বিয়ে হবে না।'

'তখন কি আমার খারাপ লাগবে না?'

রফিক কিছু বলার আগেই মিনু বলল, মোটেই খারাপ লাগবে না। কারণ তোমাকে যেই দেখবে সেই পছন্দ করবে। তুমি যে কি সুন্দর হয়েছ তা তুমি নিজেও জান না।

রূপা বলল, তুমি জেগে ছিলে?

'হ্যাঁ, জেগে ছিলাম। ঘুমের ভান করে দেখতে চাচ্ছিলাম তোমরা ভাইবোনরা কিভাবে কথা বল।'

'কিভাবে বলি?'

'স্মার্টলি বল। সহজ স্বাভাবিক। লজ্জা-টজ্জার কোন বালাই নেই। শুনতে ভালই লাগল। কে বলবে তুমি জীবন কাটিয়েছ গ্রামে।'

রফিক বলল, চল উঠা যাক। আমারো ঘুম পাচ্ছে।

মিনু বলল, না তুমি আরো খানিকক্ষণ বস। রূপা চলে যাক। আমরা দু'জন খানিকক্ষণ গল্প করি। আর রূপা শোন, জেবা বলছিল সে আজ রাতে তোমার সঙ্গে ঘুমুবে। সে হয়ত তোমার বিছানায় গম্ভীর মুখে বসে আছে। ও তোমার সঙ্গে ঘুমুলে অসুবিধা হবে না তো?

'অসুবিধা কি?'

মিনু দুঃখিত গলায় বলল, মাঝে মাঝে জেবা দুঃস্বপ্ন দেখে বিকট চিৎকার করে। ওর এই ব্যাপারটার সঙ্গে তুমি পরিচিত না। ভয় পেতে পার।

'আমি এত সহজে ভয় পাই না ভাবী।'

রফিক ইতস্তত করে বলল, জেবার মধ্যে কিছু কিছু পাগলামী ভাব আছে। রূপা, তুই ওর কোন কথায় বেশি গুরুত্ব দিবি না। যা বলে মেনে নিবি। ওকে নিয়ে আমরা একটু সমস্যায় আছি। ঢাকায় নিয়ে ডাক্তার দেখাব।

রূপা বলল, তোমরা শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করছ। জেবা চমৎকার মেয়ে। দেখো অল্পদিনেই আমি ওকে ঠিকঠাক করে দেব।

জেবা এখনো ঘুমোয়নি।

একটা বালিশ কোলে নিয়ে পা তোলে বিছানায় বসে আছে। মানুষ না, যেন সুন্দর পাথরের একটা মূর্তি। রূপা বলল, কি-রে এখনো জেগে আছিস? শুয়ে পড়।'

জেবা যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল। শীতল গলায় বলল, ফুপু আমাকে তুমি করে বলবেন। কেউ আমাকে তুই করে বললে ভাল লাগে না।

রূপা হাসতে হাসতে বলল, আদর করে তুই বলছিলাম। আর বলব না। জেবা, তুই ছাড়া আর কোন কোন জিনিস তোমার ভাল লাগে না বলে ফেল তো। জেনে রাখি।

'কেউ মিথ্যা কথা বললে আমার ভাল লাগে না।'

'আচ্ছা। ভুলেও আমি তোমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলব না। খুব সাবধানে থাকব।'

'কেউ গায়ে হাত দিয়ে আদর করলেও আমার ভাল লাগে না।'

'কখনো তোমার গায়ে হাত দিয়ে আদর করব না। তোমার কাছ থেকে সব সময় এক হাত দূরে থাকব। রাতে ঘুমুবার সময় যদি গায়ের সঙ্গে গা লেগে যায় তাতে অসুবিধা নেই তো?'

'অসুবিধা আছে।'

শোবার সময় রূপা একটা কোল বালিশ এনে দু'জনের মাঝখানে রাখতে রাখতে বলল, এই কোল বালিশটা হচ্ছে আমাদের সীমানা। একপাশে থাকবে তুমি একপাশে আমি। এবার ঠিক আছে জেবা?

'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

'এখন আরাম করে ঘুমোও।'

জেবা বলল, আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে ফুপু।

রূপা হাই তুলতে তুলতে বলল, তোমাকেও আমার পছন্দ হয়েছে। তুমি একটু অদ্ভুত! তাতে কি? অদ্ভুত মানুষই আমার ভাল লাগে। আমার একজন স্যার আছেন, তিনিও অদ্ভুত। আমি তাঁকেও খুব পছন্দ করি।

'আমি জানি।'

'কিভাবে জান?'

জেবা অস্পষ্টভাবে হাসল, কিছু বলল না। রূপা বলল, তুমি তো আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না।

'আমি সব প্রশ্নের জবাব দেই না।'

'প্রশ্নের জবাব না দেয়াটা তো অভদ্রতা।'

'প্রশ্ন করাও তো অভদ্রতা।'

'তা ঠিক। প্রশ্ন করার মধ্যেও এক ধরনের অভদ্রতা আছে।'

জেবা বলল, ফুপু আপনি ইচ্ছা করলে আমার গায়ে হাত দিয়ে আদর করতে পারেন। আমি রাগ করব না।

'আচ্ছা, জানা রইল। এখন ঘুমাও।'

'আর আমি সব সময় আপনার দলে থাকব।'

'আমার দল মানে?'

জেবা শান্ত গলায় বলল, এ বাড়িতে দুটো দল হবে। আপনার একার একটা দল। আর বাকি সবার একটা দল। অন্য দলটা চাইবে একটা ছেলের সঙ্গে আপনার বিয়ে দিতে। আপনি চাইবেন না . . . ।

'এই সব তুমি কি বলছ? এমন সব অদ্ভুত কথা তোমার মাথায় ঢুকল কিভাবে?'

'বলব না।'

জেবা পাশ ফিরল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। রূপার ঘুম এল না। এগারো বছরের এই বাচ্চা মেয়ে কি বলছে, কোত্থেকে বলছে? নিশ্চয়ই বড়দের কথা শুনে শুনে নিজের মনে একটা-কিছু দাঁড় করিয়েছে। শিশুদের মনের জগৎ খুব সহজ নয়। নানান জটিল কর্মকাণ্ড সেই জগতে হয়। শিশুরা তার খবর কখনো বড়দের বলে না।



প্রতি মাসের তিন তারিখ নীলগঞ্জ হাইস্কুলের দপ্তরী কালিপদ বাড়ি ভাড়া বাবদ মবিনুর রহমানের কাছ থেকে একশ'টা টাকা পায়। টাকাটা নিতে কালিপদের খুবই লজ্জা লাগে। যে বাড়িতে তার মত দরিদ্র ব্যক্তি নিজে থাকতে পারে না সেই বাড়ি ভাড়া বাবদ একশ টাকা নেয়া কি অন্যায় না? বাড়িটি মানুষ বাসের যোগ্য না। একটা মাত্র ঘর কোন রকমে টিকে আছে। তারও কড়িবরগা ঝুলে আছে। যে কোন মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যদি ঘটে সে কি জবাব দেবে? লোকে তো তাকেই ধরবে? হেড স্যার তাকে জিজ্ঞেস করবেন, কালিপদ তুমি জেনেশুনে এই বাড়ি কি করে ভাড়া দিলে? থানার বড় দারোগা সাহেবও তাকে থানায় ধরে নিয়ে যেতে পারেন।

ঘর যদি ভেঙে না-ও পড়ে, সাপের কামড়েও তো মানুষটা মরতে পারে। চারদিকে সাপ কিলবিল করছে। তার ছোট মেয়েটা মরল সাপের কামড়ে।

কালিপদ অবশ্যি সাপের কথা মবিন স্যারকে বলেছে। তিনি উদাস গলায় বলেছেন, সাপ আছে থাক না। অসুবিধা কি? সাপদেরও তো বাঁচার অধিকার আছে। ওরাও একটা প্রজাতি।

স্যারের কথাবার্তার ঠিক নেই। সাপ আর মানুষ এক হল। সাপ কি স্কুলে পড়াশোনা করে? বি.এ. এম.এ. পাস করে?

তা এই সব কথা স্যারকে কে বলবে? কালিপদের বলার ইচ্ছা করে। সাহসে কুলায় না। স্যার হচ্ছেন জ্ঞানী মানুষ। জ্ঞানী মানুষের সঙ্গে সে মহামূর্খ দপ্তরী কি কথা বলবে? তবে একটা ভাল ব্যাপার হচ্ছে মবিন স্যারের সঙ্গে সব কথা বলা যায়। তিনি চুপ করে শুনেন। এমনভাবে শুনেন যেন খুব জ্ঞানী একজন মানুষের কথা শুনছেন। হেড স্যারের মত কথার মাঝখানে ধমক দেন না। কথার মাঝখানে বলেন না — চুপ কর গাধা।

আজ মাসের সাত তারিখ। এ মাসের বাড়ি ভাড়া বাবদ একশ টাকা,কালিপদ এখনো পায়নি। মবিন স্যার স্কুলে আসছেন না। অথচ টাকাটা তার বিশেষ প্রয়োজন। সে ঠিক করল মবিন স্যারের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। টিফিন টাইমে হেড স্যারকে বলে ছুটি নেবে। তার ধারণা ছুটি চাইলে হেড স্যার না বলবেন না। কারণ তাঁর অনেক কাজ

সে করে দেয়। গত মাসে হেড স্যার একটা দুধেল গাই কিনেছেন। সেই গাইয়ের জন্য ঘাস কেটে আনার সব দায়িত্ব তার। এই দায়িত্ব সে নিঃশব্দে পালন করে। এমনভাবে করে যে তাকে দেখলে মনে হতে পারে এই দায়িত্ব পালন করতে পেরে সে বিমলানন্দ উপভোগ করছে। অবশ্যি কারো জন্যে কিছু করতে কালিপদের খারাপ লাগে না। ভালই লাগে। মবিনুর রহমান স্যারের জন্যেও তার সব সময় কিছু করতে ইচ্ছা করে। এখন পর্যন্ত তেমন কিছু করার সুযোগ পায়নি।

টিফিন পিরিয়ডে কালিপদ হেড স্যারের ঘরে ঢুকে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। একজন জ্ঞানী মানুষকে নিজ থেকে কিছু বলা মুশকিল। হেড স্যার বললেন, কি ব্যাপার কালিপদ?

কালিপদ মাথা চুলকাতে লাগল।

'কিছু বলবে?'

'একটা কাজ ছিল স্যার।'

'তোমার আবার কি কাজ? তোমার কাজ তো একটাই। স্কুলের বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করা।'

কালিপদের মন খারাপ হয়ে গেল। স্কুলের শতেক কাজ সে করে, তারপরেও কেউ যদি বলে তার কাজ শুধু হাঁটাহাঁটি করা তাহলে মনে লাগারই কথা।

'ছুটি চাও না-কি?'

'জ্বি। টিফিন টাইমে চলে যাব।'

'টিফিন টাইমে চলে যাব? মামার বাড়ির আব্দার? স্কুলটা কি তোমার মামার বাংলা ঘর? যাও যাও বিরক্ত করবে না।'

কালিপদ হতভম্ব হয়ে বের হয়ে এল। আজ সকালেও সে হেড স্যারের একগাদা কাজ করেছে। হেড স্যারের গাইয়ের জন্যে ঘাস কেটে দিয়ে এসেছে। পুঁই গাছের জন্যে মাচা বেঁধেছে।

কালিপদ লক্ষ্য করল তার অসম্ভব রাগ হচ্ছে। রাগ হলেই তার হাত-পা কাঁপতে থাকে। এখনো তার হাত-পা কাঁপছে। সে রাগ কমানোর জন্য বড় একটা বালতি নিয়ে পানি আনতে রওনা হল। কাজকর্মে ব্যস্ত থাকলে রাগ কমে যায়। হেড স্যার হচ্ছেন জ্ঞানী মানুষ, স্কুলের প্রধান। তাঁর উপর রাগ করা উচিত না।

স্কুলের টিউবওয়েলটা নষ্ট। অনেক দূর থেকে পানি আনতে হয়। টিউবওয়েলটা ঠিক করা উচিত। কেউ ঠিক করছে না। সামান্য একটা ওয়াসারের জন্য টিউবওয়েল নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। কালিপদ ঠিক করে ফেলল ময়মনসিংহ যাওয়া হলে সে নিজেই একটা ওয়াসার কিনে আনবে। এতে একটা ভাল কাজ করা হবে। সে তার জীবনে ভাল কাজ কিছুই করেনি। কখন ডাক এসে যাবে কে জানে। চিত্রগুপ্ত খাতা খুলে বসে

আছেন। ডাক এলেই হাজিরা দিতে হবে। যমরাজ বলবেন, ওহে কালিপদ, তুমি মর্ত্যধামে ভাল কর্ম কি কি করিয়াছ? সে তখন বলতে পারবে, স্যার স্কুলের টিউবওয়েলের জন্য একটা ওয়াসার কিনেছি।

'ইহা ছাড়া অন্য কোন সৎকর্ম কি আছে?'

'জ্বি–না।'

'খারাপ কর্ম কি কি করিয়াছ?'

'খারাপ কাজ কিছু করি নাই স্যার।'

এইটাই কালিপদের একমাত্র ভরসা।

সে খারাপ কাজ কিছু করেনি। করবেও না।

কালিপদ পানির ভারী বালতি স্কুলের বারান্দায় রাখতে রাখতে লক্ষ করল যে, তার রাগ কমে গেছে। সে স্বস্তি বোধ করল। রাগ বেশিক্ষণ পুষে রাখা ঠিক না। তা ছাড়া হেড স্যার অনায্য কিছু বলেননি। সত্যি তো স্কুল কি আর তার মামার বাড়ির বাংলা ঘর?

কালিপদ পানির বালতি রেখে মুড়ি কিনতে গেল। স্যারদের জন্যে টিফিন তৈরি হবে। এক সের মুড়ি, তিন ছটাক বাদাম। মুরি বাদাম, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ দিয়ে মাখানো হবে। খুব ঝাল হতে হবে। শিক্ষকরা টিফিন টাইমে তা খাবেন। তেল মরিচ দিয়ে মুড়ি মাখানো কোন জটিল কাজ না। বাদামের খোসা ছাড়ানোর কাজটা জটিল। কালিপদের আঙুলে তেমন জোর নেই। ভারী কাজ করতে কষ্ট হয় না। কিন্তু বাদামের খোসা ছাড়ানোর মত ছোট কাজ করতে কষ্ট হয়।

কালিপদের মন এখন একটু বিষণ্ণ কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে একগাদা কঠিন কথা শুনতে হবে। স্যাররা যখন ঝালমুড়ি খান তখন কালিপদকে অনেক কথা শুনতে হয়।

যেমন —

'লবণ দিয়ে তো বিষ বানিয়ে ফেলেছ। এতদিনেও মুড়ি বানানো শিখলে না।'

'বালি কিচকিচ করছে, ব্যাপারটা কি? এর মধ্যে খুব কম হলেও এক পোয়া বালি আছে।'

'ন্যাতাচ্যাতা মুড়ি কোত্থেকে কিনলে? মুড়িও চেন না?'

এই সব কথার কোন জবাব কালিপদ দেয় না। মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। মনে মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। শুধু দু'জন লোক কখনো তাকে কিছু বলেন না। একজন মবিনুর রহমান, অন্যজন জালালুদ্দিন স্যার। মুড়ির বাটি জালাল স্যারের সামনে রাখা মাত্র তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক তোমার ভাল করুন কালিপদ।

আজও তাই বললেন।

কালিপদ বলল, স্যারের শরীর ভাল?

'হ্যাঁ, শরীর ভাল। মনটা ভাল না। শোন কালিপদ, তোমরা জন্য একটা চিঠি আছে।'

কালিপদ বিস্মিত হয়ে বলল, চিঠি?

'হুঁ। চিঠি। গতকাল মবিনের কাছে গিয়েছিলাম। সে তোমাকে চিঠি দিয়েছে। চিঠি পড়তে পার?'

'জ্বি স্যার, পারি। উনার শরীর কেমন?'

'বেশি ভাল না।'

মুখ বন্ধ খাম নিয়ে কালিপদ আড়ালে সরে গেল। চিঠি পড়তে পারে কি–না এটা জিজ্ঞেস করায় সে মনে কষ্ট পেয়েছে। স্কুলে চাকরি করে আর সে একটা চিঠি পড়তে পারবে না? ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছে। বাবা মরে যাওয়ায় আর পড়াশোনা হল না। জালাল স্যার পুরানো লোক। উনি কেমন করে এই ভুল করেন?

কালিপদ টিউবওয়েলের পাশে বসে পর পর চারবার চিঠিটা পড়ল।

কালিপদ,

আমি খুব লজ্জিত যে যথাসময়ে তোমাকে বাড়ি ভাড়া বাবদ একশ টাকা দিতে পারিনি। আমার মনে ছিল তবু দেয়া হয়নি। শরীর বিশেষ ভাল না বলে স্কুলে যাচ্ছি না। তোমার সঙ্গে দেখাও হচ্ছে না। তোমার অসুবিধা সৃষ্টি করায় আমি ক্ষমা প্রার্থী। এখন টাকাটা পাঠালাম। — ইতি মবিনুর রহমান।

কালিপদের চোখে পানি এসে গেল। মবিন স্যারের মত একজন জ্ঞানী লোক বলছেন ক্ষমা প্রার্থী। সে কে? সে কেউ না। সে একজন অধম দপ্তরী।

কালিপদ ঠিক করে ফেলল আজ সন্ধ্যায় স্যারকে দেখতে যাবে। খালি হাতে যাবে না। কিছু–একটা নিয়ে যাবে। পাকা পেঁপে, কলা। শরীর বেশি খারাপ দেখলে রাতে থেকে যাবে। যদিও ঐ বাড়িতে থাকতে তার ভয় লাগে। সাপের ভয়। যত ভয়ই লাগুক সে যাবে। হেড স্যারের গাইকে ঘাস এনে দিয়েই রওনা হবে।

সন্ধ্যার পর পর কালিপদের যাওয়া হল না। কারণ হেড স্যার হঠাৎ সদরে যাবেন বলে ঠিক করেছেন। তাঁর স্যুটকেস স্টেশন পর্যন্ত দিয়ে আসতে হবে। স্টেশন এখান থেকে পাঁচ মাইলের মত দূরে।

কালিপদ বিনা বাক্যব্যয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হল।

'সদরে যাচ্ছি কেন জানিস না–কি কালিপদ?'

'জ্বে না।'

'ডিইও সাহেব খবর পাঠিয়েছেন। মবিন সাহেবের গম চুরির ব্যাপারে কথা বলতে চান। ঘটনা শুনে উনি খুবই ক্ষিপ্ত। আমাকে বললেন — শুধু চাকরি থেকে ডিসমিস

করলে এতবড় অপরাধের শাস্তি হয় না। অপরাধীকে জেলে ঢুকাতে হবে। আমি অবশ্যি বলেছি মানী লোক একটা ভুল করেছে। বাদ দেন। ডিইও সাবে শুনতে চান না।

কালিপদ কিছু বলল না। গম চুরির কথা সে শুনেছে। একশ বস্তা গম স্কুলে দেয়া হয়েছিল। মবিন স্যার দস্তখত করে এনেছেন। কিন্তু একশ বস্তা না, এনেছেন মাত্র দশ বস্তা। এই নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা হচ্ছে। স্বয়ং ভগবান যদি স্বর্গ থেকে নেমে এসে কালিপদকে বলেন — মবিনুর রহমান গম চুরি করেছে — কালিপদ বিশ্বাস করবে না। তবে তার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কি যায় আসে? সে হল মূর্খ দপ্তরী। স্কুলে ঘন্টা দেয়া ছাড়া সে কিছুই জানে না।

'কালিপদ!'

'জ্বি স্যার।'

'মানুষের চেহারা দেখে বুঝা মুশকিল তার ভেতরটা কেমন। মবিনকে দেখে কে বলবে — ভেতরে ভেতরে সে এত বড় শয়তান।'

কালিপদ চুপ করে রইল। কথা বলার কোন অর্থ হয় না।

'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। এইটাই নিয়ম। নিয়তি কঠিন জিনিস। নিয়তির হাত এড়ানো মুশকিল। লখিন্দরের নিয়তি ছিল সাপের হাতে মরা। মরল কি-না বল। লোহার ঘর বানিয়ে লাভ হয়েছিল?'

ট্রেন এল রাত দশটায়। আটটায় আসার কথা — দু'ঘন্টা লেট। এই দু'ঘন্টা কালিপদ স্টেশনে বসে রইল। হেড স্যারকে রেখে চলে আসা যায় না। মালপত্র তুলে দিতে হবে।

বাঁড়ি ফিরতে ফিরতে এগারোটা বেজে গেল। এত রাতে মবিন স্যারের কাছে যাওয়া ঠিক না। স্যার হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছেন। অসুস্থ মানুষ সকাল সকাল ঘুমুতে যাবার কথা। তবু কালিপদ ভাবল, একবার যখন ঠিক করেছে যাবে — যাওয়াই উচিত।

স্যার ঘুমিয়ে থাকলে চলে আসবে। অসুবিধা তো কিছু নেই।

মবিনুর রহমান ঘুমাননি। তিনি তাঁর দূরবীন ফিট করেছেন। দূরবীন তাক করা হয়েছে 'অনুরাধা' নক্ষত্রের দিকে। প্রাচীন ভারতে 'অনুরাধা' একটি বিশেষ নক্ষত্র। তখন নিয়ম ছিল বিয়ের পর স্ত্রীকে সন্ধ্যাবেলা অনুরাধা নক্ষত্র দেখিয়ে বলতে হবে — 'অনুরাধার' মত দৃঢ়চিত্র ও পুত চরিত্রের হও। তারপরই শুধু স্ত্রীকে ঘরে নেয়া যাবে। আগে নয়।

কালিপদ বলল, স্যার কি করেন?

মবিন সাহেব দূরবীন থেকে চোখ না সরিয়েই বললেন, অনুরাধা নক্ষত্র দেখি। খুব উজ্জ্বল নক্ষত্র। আলো স্থির হয়ে থাকে।

তিনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন কালিপদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। রাতদুপুরে তার উপস্থিতি হওয়ায় মোটেই বিস্মিত হননি।

'কালিপদ!'

'জ্বি স্যার।'

'দেখবে না-কি?'

'কি দেখব স্যার?'

'অনুরাধা নক্ষত্র। দেখ, এইখানে চোখ লাগাও। বাঁ চোখ বন্ধ কর।'

কালিপদ দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থেকেও কিছুই দেখতে পেল না। মবিন সাহেব যখন বললেন, দেখা যাচ্ছে? কালিপদ শুধুমাত্র তাঁকে খুশি করার জন্য বলল, জ্বি স্যার। বড়ই সৌন্দর্য।

'হ্যাঁ, সুন্দর তো বটেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পুরোটাই সুন্দর। প্রকৃতি অসুন্দর কিছু তাঁর জগতে স্থান দেননি।'

কালিপদ প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বলল, আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে স্যার?

'না। রান্না করিনি এখনো।'

'আপনি স্যার কাজ করেন, আমি রান্না করে ফেলি।'

'আচ্ছা।'

'ঘরে তেল মশলা আছে তো স্যার?'

'সব আছে। গতকাল বাজার করেছি।'

'আপনার শরীর শুনেছিলাম খারাপ।'

'না শরীর ঠিক আছে। মাঝে মাঝে ভয়ংকর সব স্বপ্ন দেখি, তখন সব উলট-পালট হয়ে যায়।'

'কি দেখেন?'

'দেখি কয়েকটা বুড়ো মানুষ। এদের শরীর দেখা যায় না, শুধু মুখ দেখা যায়। এরা এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।'

'দেখতে কেমন স্যার?'

'লম্বা মুখ। সামান্য দাড়ি আছে...'

বলতে বলতে মবিনুর রহমান অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, কালিপদ।

'জ্বি স্যার।'

রূপাকে আজ পড়াতে যাওয়ার কথা ছিল, যেতে পারিনি। শরীরটা ভাল লাগছে না। কয়েকদিন যাব না। আমি একটা চিঠি লিখে রেখেছি, তুমি মেয়েটাকে দিয়ে এসো। কাল ভোর বেলা দিলেই হবে।

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

চিঠি খুব সাদামাটা — 'রূপা, আমি কয়েকদিন আসতে পারব না। তুমি নিজে নিজে পড়। মন নানান কারণে অস্থির হয়ে আছে। একটু স্থির হলেই আসব।'

চিঠি সাদামাটা হলেও কিন্তু সাদামাটা নয়। চিঠির উল্টো পিঠে তিনি অসংখ্যবার লিখেছেন — রূপা, রূপা। এর পেছনেও একটা লজিক আছে। বল পয়েন্টের কলমে কালি আটকে যাচ্ছিলো, তিনি কলম ঠিক করার জন্যেই রূপা রূপা লিখেছেন। অন্য কিছুও লিখতে পারতেন। লিখেননি কারণ চিঠিটি যেহেতু রূপাকে লিখবেন সেহেতু তাঁর নামই মনে এসেছে। আবার এও সতি যে, এই নামটাই তিনি অসংখ্যবার লিখতে চেয়েছেন। অজুহাত হিসেবে ভাবছেন কলমে কালি আটকে যাচ্ছে বলে — অসংখ্যবার রূপার নাম লিখতে হয়েছে। কোনটা সত্যি কে জানে, হয়ত সবটাই সত্যি।

এই বিশেষ চিঠিটি রূপার হাতে আসার আধঘন্টা আগে মজার একটা ব্যাপার হল। জেবা এসে বলল, ফুপু কিছুক্ষণের মধ্যে তুমি এমন একটা কিছু পাবে যে আনন্দে তোমার মরে যেতে ইচ্ছা করবে। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হবে।

'কি পাব?'

'কি পাবে তা জানি না, তবে কিছু-একটা পাবে।'

রূপা বিরক্ত হয়ে বলল, কি যে অদ্ভুত কথা তুমি বল।

তার কিছুক্ষণ পর কালিপদ চিঠিটা দিল। রূপার আনন্দে মরে যেতে ইচ্ছা করল। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করল। ইচ্ছা করল পৃথিবীর সব মানুষকে ডেকে বলে — দেখ, তোমরা দেখ, স্যার কতবার আমার নাম লিখেছেন।

রূপার চোখে পানি এসে গেছে। জেবা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার মুখ ভাবলেশহীন। তবে ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি।



হেড মাস্টার হাফিজুল কবির সাহেব আজ একটু ব্যস্ত। ব্যস্ততার নানাবিধ কারণের একটি হচ্ছে নেত্রকোনা থেকে সিও রেভিন্যু এসেছেন গম চুরির তদন্তে। ভদ্রলোকের বয়স অল্প। নিতান্তই চেংড়া ধরনের। অল্পবয়স্ক অফিসাররা ঠাণ্ডা মাথায় কিছু ভাবে না। দশজনের কথা শুনতেও চায় না। হুট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। গরম গরম কথা বলে। মানী লোকের মান রাখতে জানে না।

হাফিজুল কবির সাহেব যত্নের চূড়ান্ত করছেন। সিও সাহেব স্কুলে পা দেয়ার পরপরই তাঁকে দৈ মিষ্টি দেয়া হয়েছে। চায়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। কালিপদ স্কুলের বারান্দায় কেরোসিন কুকারে চা বসিয়ে দিয়েছে। হাফিজুল কবির সাহেব এক প্যাকেট বেনসন সিগারেট এনে সিও সাহেবের সামনে রেখেছেন। তিনি প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট ধরিয়েছেন। এটা আশার কথা। যদি বলতেন — সিগারেট কেন? তাহলে চিন্তার ব্যাপার হত।

সিও সাহেব বললেন, গম চুরির ব্যাপারে আপনারা নিজেরা কোন তদন্ত করেছেন?

হেড মাস্টার সাহেব বললেন, জ্বি না স্যার।

'করেননি কেন?'

'তদন্ত কমিটি করা হয়েছে কিন্তু কমিটির বৈঠক বসেনি।'

'বৈঠক বসল না কেন?'

'সেটা স্যার আমি বলতে পারি না। আমি কমিটিতে নেই।'

'মবিন সাহেবকে কি আপনি সরাসরি জিজ্ঞেস করেছেন?'

'কি জিজ্ঞেস করব? আমি কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

'গম চুরির বিষয়ে তাঁর কি বলার আছে তা জানতে চেয়েছেন?'

'জ্বি - না।'

'জিজ্ঞেস করেননি কেন?'

'মানী লোক। জিজ্ঞেস করতে লজ্জা লাগল।'

'ডাকুন, উনাকে ডাকুন। আমি জিজ্ঞেস করি . . . '

'উনি স্যার স্কুলে আসেননি। কয়েকদিন ধরেই আসছেন না।'

'আই সি।'

'লজ্জাতেই বোধ হয় আসতে পারছেন না।'

'চুরি করবার সময় মনে ছিল না, এখন লজ্জায় মরে যাচ্ছেন। শুনুন হেড মাস্টার সাহেব, এ্যাডমিনিস্ট্রেশান খুব সিরিয়াসলি ব্যাপারটা নিয়েছে। আপনি জানেন কি-না জানি না। জাতীয় দৈনিকে চিঠি ছাপা হয়েছে।'

'বলেন কি স্যার?'

হেড মাস্টার সাহেব বিস্মিত হবার ভঙ্গি করলেন। চিঠি ছাপার ব্যাপারটা তিনি খুব ভালমত জানেন। চিঠি তাঁরই লেখা। নেত্রকোনা গিয়ে নিজের হাতে পোস্ট করেছেন। সব ক'টা দৈনিকে চিঠি দিয়েছিলেন। শুধু একটাতে ছাপা হয়েছে। হেড মাস্টার সাহেব বললেন, চিঠিতে কি লেখা স্যার?

সিও সাহেব ব্রীফ কেইস থেকে খবরের কাগজ বের করে এগিয়ে দিলেন। বিরস মুখে বললেন, কাগজটা আপনার কাছে রেখে দিন। হেড মাস্টার সাহেব অনেকবার পড়া চিঠি আবারো পড়লেন —

সরিষায় ভূত

নেত্রকোনা নীলগঞ্জ হাই স্কুলে সম্প্রতি গম চুরির এক কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটিয়াছে। উক্ত স্কুলের জনৈক প্রবীণ শিক্ষক স্কুলের জন্য বরাদ্দকৃত ১০০ বস্তা গমের মধ্যে ৯০ বস্তা গায়েব করিয়া দেন। এই ঘটনা অত্র অঞ্চলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। যাহাদের হাতে শিশু-কিশোরদের নীতি শিক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত তাহারা যদি চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হন তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ কি? জনগণের মনে আজ এই প্রশ্নই আলোড়িত হইতেছে।

জনৈক অভিভাবক
নীলগঞ্জ হাই স্কুল।

হেড মাস্টার সাহেব শুকনো মুখে বললেন, পত্রিকায় খবর কে দিল?

সিও সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, পত্রিকায় খবর কে দিল এটা নিয়ে চিন্তা করে লাভ কি? আমরা এ্যাকশন কি নিয়েছি সেটা হল কথা। ক্রিমিন্যাল কেইস করা হয়েছে?

'জ্বি-না স্যার। শুধু জি ডি এন্ট্রি করেছি।'

'কেইস করে দিন। মিস এপ্রোপ্রিয়েশন অব পাবলিক ফান্ড।'

'সেটা কি স্যার ঠিক হবে?'

'অবশ্যই ঠিক হবে। এই সঙ্গে সাসপেনসন অর্ডার দিয়ে দিন।'

'সাসপেনসন?'

'হ্যাঁ।'

'স্কুলে স্যার এ-রকম ব্যবস্থা নেই।'

'ব্যবস্থা নেই, ব্যবস্থা করুন। স্কুলে গভর্নিং বডির মিটিং দিন। মিটিং-এ ডিসকাস করুন।'

'আপনি বললে অবশ্যই করব।'

'মনে রাখবেন, বর্তমান সরকার এ-জাতীয় কেলেংকারি সহ্য করবে না। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ আমাদেরই তৈরি করতে হবে। পত্র-পত্রিকায় চিঠি ছাপা হয়ে গেছে। জনমত তৈরি হয়ে গেছে। আর অবহেলা করা যায় না।'

'তা তো বটেই স্যার।'

'গভর্নিং বডির মিটিং ডাকুন। আজই ডাকুন।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

গভর্নিং বডির মিটিং-এ পত্রিকায় ছাপা চিঠি পড়া হল। হেড মাস্টার সাহেব সিও রেভিন্যু সাহেব যা যা বলে গিয়েছেন সব আবারো বললেন এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কি করি কিছুই বুঝতে পারছি না। প্রাইভেট স্কুল হলেও সরকারী চাপ অগ্রাহ্য করা সম্ভব না। আমরা গভর্নমেন্ট ডিএ নেই। ডিএ বন্ধ হয়ে গেলে স্কুল উঠিয়ে দিতে হবে।

গভর্নিং বডির একজন মেম্বার হলেন রূপার বাবা আফজাল সাহেব। তিনি বললেন, পুরো ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য। মবিনুর রহমান এই কাজ করতে পারেন না। কোথাও ভুল হয়েছে। অবশ্যই ভুল হয়েছে।

হেড মাস্টার সাহেব বললেন, ভুল হবার কোন ব্যাপার না। মবিন সাহেব সিগনেচার করে গম নিয়েছেন।

'আত্মভোলা মানুষ। তাঁকে প্যাঁচে ফেলে আটকানো হয়েছে। এটা নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না।'

'গমের দায়িত্ব তাহলে কে নিবে?'

ঘণ্টাখানিক আলাপ-আলোচনা করেও কোন সিদ্ধান্তে আসা গেল না। আফজাল সাহেব মন খারাপ করে ঘরে ফিরলেন। মবিনুর রহমানকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেন। তিনি বুঝতে পারছেন মবিনুর রহমান কোন-একটা চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁর ক্ষীণ সন্দেহ হচ্ছে এই চক্রান্তে হেড মাস্টার সাহেবের একটা ভূমিকা আছে। কিন্তু কি ভূমিকা তা ধরতে পারছেন না। মবিনুর রহমানের সঙ্গে হেড মাস্টার সাহেবের কোন শত্রুতা থাকার কথা নয়। একদল মানুষ আছে যাদের কখনো কোন শত্রু তৈরি হয় না। মবিনুর রহমান সেই দলের মানুষ। কিন্তু এখানে তিনি কি করে ঝামেলায় জড়িয়ে গেলেন? এই ঝামেলা থেকে মুক্তির উপায়ই বা কি?

আফজাল সাহেবের মন-খারাপ ভাব বাসায় এসে কেটে গেল। কি কারণে মন খারাপ তাও পর্যন্ত মনে রইল না। তাঁর মেজো ছেলে জহির এসেছে চিটাগাং থেকে। সঙ্গে তার বন্ধু তানভির। রাজপুত্রের মত ছেলে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখতে হয়। ছেলের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলেই তাঁর মনে হল যে ভাবেই হোক এই ছেলের সঙ্গে রূপার বিয়ে দিতে হবে। একে কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না। তিনি ঘাটে লোক পাঠালেন ভাল মাছের জন্যে। যাকে পাঠালেন তার উপর ঠিক ভরসা করতে পারলেন না। নিজেই খানিকক্ষণ পর রওনা হলেন। তানভির বলল, চাচা আপনি যাচ্ছেন কোথায়?

'মাছের জন্যে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে ঘাটে খুব ভাল মাছ পাওয়া যায়।'

'চাচা, আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি?'

'যেতে চাও?'

'অবশ্যই যেতে চাই।'

'রাস্তায় কিন্তু খুব কাদা।'

তানভির হাসতে হাসতে বলল, আমি খালি পায়ে যাব।

ঘাট থেকে সবচে' বড় চিতল মাছটি কেনা হল। আফজাল সাহেব মাছের দাম দিতে পারলেন না। তানভির দাম দিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে রাতে খাবার সময় তানভির বলল, আমি তো চিতল মাছ খাই না।

আফজাল সাহেব হতভম্ব হয়ে বললেন, সে কি! চিতল মাছ খাও না তাহলে কিনলে কেন? ঘাটে আরো তো মাছ ছিল।

তানভির হাসতে হাসতে বলল, আমার পরিকল্পনা ছিল সবচে' বড় মাছটি কিনব। তাই কিনেছি। কিনেছি বলেই যে খেতে হবে সে রকম তো কোন আইন নেই।

তানভির হচ্ছে সেই ধরনের মানুষ যারা আশেপাশের সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পছন্দ করে। এবং অতি সহজেই তা পারে। রাত দশটায় সে ঘোষণা করল — ম্যাজিক দেখানো হবে। বাচ্চারা যারা এখনো ঘুমাওনি চলে এসো। বাচ্চা বলতে জেবা এবং রুবাবা। রুবাবা ঘুমিয়ে পড়েছে। জেবা জেগে আছে। তবে সে কঠিন মুখে বলল, ম্যাজিক আমার ভাল লাগে না। আমি দেখব না। রূপাও বলল, তার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে, সে কিছু দেখবে না।

মিনু বলল, পাগলামী করো না তো রূপা। এসো। এমন চমৎকার একটা ছেলে আর তুমি মুখ শুকনো করে আছ? কি কান্ড! শাড়ি বদলে একটা ভাল শাড়ি পর।

রূপা বলল, বেনারসী পরব?

'বেনারসী তো পরবেই। কয়েকটা দিন পর। আপাতত সুন্দর একটা শাড়ি পর। নীল সিল্কের শাড়িটা পর।'

'নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে দেখতে যাব?'

'সাজা তো অপরাধ না।'

'আমার ইচ্ছে করছে না। তাছাড়া ভাবী বিশ্বাস কর, আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।'

'এসো তো তুমি। আমাদের তরুণ ম্যাজিসিয়ান সাহেব তোমার মাথা ধরা সারিয়ে দেবেন। আর যদি সারাতে না পারেন তাহলে আমার কাছে এ্যাসপিরিন আছে।'

গ্রহরা যেমন নক্ষত্রকে ঘিরে রাখে তানভিরকে তেমনি সবাই ঘিরে আছে। আসরের মধ্যমণি হয়ে সে বসে আছে নক্ষত্রের মতই। তার সামনে একটা খবরের কাগজ। এই কাগজ দিয়েই ম্যাজিক দেখানো হবে। আপাতত গল্প-গুজব হচ্ছে। কথক তানভির একা। বাকি সবাই মুগ্ধ শ্রোতা। রূপা শাড়ি বদলেছে। চুল বেঁধেছে। মিনু খুব হালকা করে রূপার চোখে কাজলও দিয়েছে। তার প্রয়োজন ছিল না। রূপাকে এম্নিতেই ইন্দ্রানীর মত দেখায়।

তানভিরের গল্প বলার কৌশল চমৎকার। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাচ্ছে এত সহজে যে মাঝে মাঝে মনে হয় সব গল্প বোধহয় সাজানো। নম্বর দেয়া আছে কোন গল্পের পর কোনটি বলা হবে। সে রূপার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘদিনের চেনা মানুষের মত বলল, রূপা তুমি কি মোনালিসার ছবি দেখেছ?

রূপা হকচকিয়ে গেল। নিতান্ত অপরিচিত একজন মানুষ পরিচিতের ভঙ্গিতে কথা বললে হকচকিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

'দেখেছ মোনালিসার বিখ্যাত ছবি?'

'জ্বি।'

'অরিজিন্যাল নিশ্চয়ই দেখনি — রিপ্রডাকশান দেখেছ। দেখারই কথা। পৃথিবীর অন্য কোন ছবি এত খ্যাতি পায়নি। এত লক্ষ কোটি বার অন্য কোন ছবির রিপ্রডাকশানও হয়নি। বলা যেতে পারে মোনালিসা হচ্ছে এই পৃথিবীর সবচে' খ্যাতনামা মহিলা। অফকোর্স ছবির মহিলা। এখন বল দেখি এই মহিলার বিশেষত্ব কি?'

'চোখ!'

'উহুঁ, চোখ না। যদিও সবাই চোখ চোখ বলে মাতামাতি করে তবু আমার মনে হয় অন্য কিছু। কি তা-কি জান?'

'না।'

'মোনালিসার ভুরু নেই। এই জগদ্বিখ্যাত মহিলার জগদ্বিখ্যাত চোখের ভুরু নেই। কি, ব্যাপারটা অদ্ভুত না?'

রূপা কিছু না বললেও মনে মনে স্বীকার করল ব্যাপারটা অদ্ভুত। তানভির হাসতে হাসতে বলল, আমার কথা বোধহয় ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। আচ্ছা, আমি হাতে-নাতে প্রমাণ করে দিচ্ছি। আমার মানিব্যাগে মোনালিসার পাসপোর্ট সাইজের একটা ছবি আছে।

তানভির মানিব্যাগ থেকে ছবি বের করল। ছবি সবার হাতে হাতে ফিরছে। সবাই চোখ কপালে তুলে বলছে — তাই তো! তাই তো! রূপার একটু মন খারাপ লাগছে। কারণ তার কাছে পরিস্কার হয়ে গেছে এই মানুষটির প্রতিটি গল্প সাজানো। সাজানো বলেই মানিব্যাগে মোনালিসার ছবি রেখে দেয়া।

'আচ্ছা, এখন শুরু হবে ম্যাজিকের খেলা। এখানে একটা খবরের কাগজ আছে। সবার সামনে কাগজ কেটে আমি দু'খণ্ড করব, তারপর জোড়া দেব।'

জহির বলল, আমি কাটতে পারি? না-কি ম্যাজিসিয়ানকেই কাটতে হবে?'.

'যে কেউ কাটতে পারবে।'

মিনু বলল, রূপা কাটুক, রূপা।

রূপা কাগজ কাটল। কাটা কাগজ রুমাল দিয়ে ঢাকা হল। রূপা ভেবেছিল রুমাল উঠাবার পর দেখা যাবে কাগজ জোড়া লেগেছে। রুমাল উঠাবার পর দেখা গেল কাগজের টুকরাগুলো নেই। সেখানে সুন্দর একটা কাগজের ফুল। সোবাহান সাহেবের মত মানুষও চেঁচিয়ে বললেন, অপূর্ব, অপূর্ব! অপূর্ব!!

আসর ভাঙল রাত বারোটায়। রূপা ঘুমুতে গিয়ে দেখল জেবা এখনো জেগে। মশারি ফেলে মশারির ভেতর চুপচাপ বসে আছে। রূপা বিস্মিত হয়ে বলল, এখনো জেগে?

'হুঁ।'

'কেন? ঘুম আসছে না?'

'না।'

রূপা হালকা গলায় বলল, আমরা সুন্দর ম্যাজিক দেখলাম। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকলে তোমারও ভাল লাগত। এসো এখন ঘুমানো যাক। ঘুমানোর আগে কি পানি খাবে? বাথরুমে যাবে?

'না।'

বাতি নিভিয়ে রূপা মশারির ভেতর ঢুকতেই জেবা বলল, ফুপু ঐ লোকটা তোমাকে পছন্দ করেছে। খুব বেশি পছন্দ করেছে। এখন সবাই মিলে ঐ লোকটার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দেবে।

রূপা হালকা গলায় বলল, দিলে দিবে। কি আর করা।

জেবা রূপার কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বলল, এখন থেকে এই বাড়িতে দু'টা দল হল। ঐ লোকটার একটা দল। সবাই সেই দলে। আর তোমার একার একটা দল। তোমার দলে শুধু আছি আমি একা।

রূপা বলল, কি সব অদ্ভুত কথা যে তুমি বল। এখন ঘুমাও তো।

জেবা বলল, আমি মোটেও অদ্ভুত কথা বলছি না। আমি যে অদ্ভুত কথা বলছি না তুমি তাও জান। খুব ভাল করে জান।

রূপা বলল, ঘুমাও তো জেবা। প্লীজ ঘুমানোর চেষ্টা কর।

'আচ্ছা।'

জেবা পাশ ফিরল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। রূপা ঘুমুতে পারল না। রাতজাগা তার অভ্যাস হয়ে গেছে। জেগে থাকতে খারাপও লাগছে না। তক্ষক ডাকছে। গভীর রাতে তক্ষকগুলি অন্য রকম করে ডাকে। দিনে তাদের ডাক এক রকম, রাতে অন্য রকম। স্যারকে একবার জিজ্ঞেস করতে হবে। উনি নিশ্চয়ই চমৎকার কোন ব্যাখ্যা দেবেন। স্যারকে একটা ধাঁধাও জিজ্ঞেস করতে হবে। তবে ধাঁধা জিজ্ঞেস করলে উনি খানিকটা হকচকিয়ে যান এবং এমন অস্থির বোধ করেন যে রূপারই খারাপ লাগে। একবার সে স্যারকে জিজ্ঞেস করল, স্যার বলুন তো এটা কি — আমবাগানে টুপ করে শব্দ হল। একটা পাকা আম গাছ থেকে পড়েছে।

যে দু'জন শুনল সে দু'জন গেল না।
অন্য দু'জন গেল।।
যে দু'জন গেল সে দু'জন দেখল না
অন্য দু'জন দেখল।।
যে দু'জন দেখল সে দু'জন তুলল না
অন্য দু'জন তুলল।
যে দু'জন তুলল সে দু'জন খেল না
অন্য একজন খেল।।

স্যার এখন বলুন ব্যাপারটা কি?

তিনি গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন। করুণ গলায় বললেন — ব্যাপারটা তো মনে হচ্ছে খুব জটিল।

'মোটেই জটিল না স্যার। অত্যন্ত সহজ।'

তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, জটিল জিনিসের ব্যাখ্যা খুব সহজ হয়। সহজ জিনিসের ব্যাখ্যাই জটিল।

রূপার মনে হল স্যারের কথাটা তো খুব সত্যি। ভালবাসা ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ কিন্তু ব্যাখ্যা কি অসম্ভব জটিল না?

তক্ষক ডাকছে। জেগে আছে রূপা। আজ রাতটাও মনে হচ্ছে তাকে জেগেই কাটাতে হবে।



কিছু-একটা হয়েছে রূপাদের বাড়িতে।

সবার মুখ হাসি হাসি। সবার মধ্যে চাপা উত্তেজনা। বড় ধরনের আনন্দের কোন ঘটনা এ-বাড়িতে ঘটে গেছে কিংবা ঘটতে যাচ্ছে। তবে এই ঘটনা নিয়ে কেউ আলোচনা করতে চাচ্ছে না। আলোচনা করতে না চাইলেও রূপার ধারণা সে ব্যাপারটা আঁচ করতে পারছে।

বিকেলে মিনু বলল, রূপা শুনে যাও তো। এসো আমার সঙ্গে।

'কোথায়?'

'ছাদে।'

'কোন গোপন কথা?'

'গোপন কথা কিছু না, প্রকাশ্য কথা — ছাদে তোমার চুল বাঁধতে বাঁধতে বলব।'

রূপা ছাদে গেল। মিনু তার চুল বাঁধতে বাঁধতে বলল, তানভির জায়গাটা ঘুরে ফিরে দেখতে চায়। তুমি তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুবে।

'এটাই তোমার প্রকাশ্য কথা?'

'না এটা প্রকাশ্য কথা না। প্রকাশ্য কথা হল — তানভির কাল রাতে ম্যাজিকের আসর শেষ হবার পরে তোমার ভাইয়াকে বলেছে — সে তোমাকে পছন্দ করেছে। শুধু পছন্দ না, অসম্ভব পছন্দ করেছে।'

'ও আচ্ছা।'

'ঘটনা এইখানেই শেষ না। আজ ভোরে সে বলেছে, সে এই আমাদের বাড়িতেই তোমাকে বিয়ে করতে চায়। তারপর বউ নিয়ে চলে যাবে।'

'এত তাড়া কেন?'

'তাড়া না। কথা এমনই ছিল। সে খুব খেয়ালি ছেলে। আমাদের এখানে আসার আগে তার বাবা তোমার মেজো ভাইকে খবর দিয়ে নিয়ে যান এবং বলেন — আমার ছেলে যদি কোন মেয়েকে পছন্দ করে ওকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেবে। এই ছেলে বড় যন্ত্রণা করছে। কিছুতেই তাকে বিয়ে করাতে রাজি করানো যাচ্ছে না।

রূপা বলল, বিয়েটা হচ্ছে কবে? আজই না-কি?

মিনু হাসতে হাসতে বলল, তোমার ভাইদের ইচ্ছা আজ সন্ধ্যাতেই মৌলানা ডাকিয়ে বিয়ে দিয়ে দেয়া। তা তো সম্ভব না। সবাইকে খবর দিতে হবে। ছেলের আত্মীয়-স্বজনদের জানাতে হবে। দিন সাতেক তো লাগবেই।

'এই সাতদিন আমি ভদ্রলোককে নিয়ে গ্রাম দেখাব, নদী দেখাব?'

'হ্যা, বন্ধুর মত পাশাপাশি থাকবে।' প্রেম প্রেম খেলবে।

রূপা সহজ গলায় বলল, আচ্ছা।

মিনু বলল, তোমার ভাগ্য দেখে আমার ঈর্ষা হচ্ছে রূপা।

রূপা বলল, আমার নিজেরই ঈর্ষা হচ্ছে, তোমার তো হবেই। আমি বৃশ্চিক রাশির মেয়ে। বৃশ্চিক রাশির মেয়েদের ঈর্ষা না করে উপায় নেই। এরা হয় খুব উপরে উঠবে কিংবা ধুলার সঙ্গে মিশে যাবে। এদের কোন মধ্যম পন্থা নেই।

'কে বলেছে?'

'রাশিচক্র বলে একটা বই পড়ে সব জেনে বসে আছি।'

রূপা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল। এই হাসি মিনুর ভাল লাগল না। তবে সে সাজগোজ করতে মোটেই আপত্তি করল না। আকাশী রঙের একটা শাড়ি পরল। যা কখনো করে না তাই করল, মা'র কাছ থেকে চেয়ে গয়না পরল। দীর্ঘ সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। জেবা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। জেবাকে বলল, কেমন দেখাচ্ছে জেবা?

জেবা হাসল। জবাব দিল না।

'বল তো আমাকে ইন্দ্রানীর মত লাগছে কি-না?'

জেবা এই প্রশ্নেরও জবাব দিল না। আবারো হাসল। যেন সে রূপার ছেলেমানুষিতে খুব মজা পাচ্ছে।

রাস্তায় নেমেই রূপা বলল, আপনি কোন দিকে যেতে চান?

'তানভির বলল, যে-দিকে ইচ্ছা সেদিকে যেতে পারি।

'নদী দেখবেন? নদী?'

'অবশ্যই নদী দেখব? বাঙালী ছেলে হয়ে নদী দেখব না, তা-কি হয়।'

'হাঁটতে হবে কিন্তু।'

'হাঁটতে হলে হাঁটব। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি ঢাকা থেকে হেঁটে মানিকগঞ্জ

গিয়েছিলাম। ননস্টপ হাঁটা। পথে একবার শুধু একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে চা খেয়েছি। ভাল কথা রূপা, চা ভর্তি একটা ফ্লাস্ক সঙ্গে নিলে হত না? নদীর তীরে বসে চা খাওয়া যেত।'

'আমি আপনাকে চা খাওয়াবার ব্যবস্থা করব।'

'কিভাবে করবে?'

'আমি যেখানে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে আমার এক স্যারের বাসা। স্যারের বাসা থেকে চা বানিয়ে আনব। ঘাটে স্যারের একটা নৌকা আছে। সব সময় নৌকা বাঁধা থাকে। ঐ নৌকায় বসে চা খাব।'

'ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া।'

'আপনি নৌকা বাইতে পারেন?'

'পারি না, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি। নৌকা চালানো খুব কঠিন হবার কথা না। নৌকা তো এরোপ্লেন না।'

'নৌকা চালানো যথেষ্টই কঠিন। এরোপ্লেন চালানোর জন্যে কত যন্ত্রপাতি আছে। বোতাম টিপলেই হল। নৌকার তো কোন বোতাম নেই।'

তানভিরের কাছে মেয়েটিকে আজ অন্য রকম লাগছে। স্মার্ট একটি মেয়ে যে কথার পিঠে কথা বলতে পারে এবং গুছিয়ে বলতে পারে। মেয়েটি বড় হয়েছে গ্রামে অথচ কত সহজ ভঙ্গিতে হাঁটছে। গল্প করছে। বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতা নেই।

রূপা বলল, আমার স্যারকে দেখে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।

'কেন বল তো?'

'খুব জ্ঞানী মানুষ। সন্ন্যাসীদের মত। চিরকুমার।'

তানভির সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, কিছু কিছু মানুষ আছে টাকা-পয়সার অভাবে এবং সাহসের অভাবে বিয়ে করতে পারে না। তারা হয়ে যায় চিরকুমার। কিছু কিছু পাগলামি তাদের মধ্যে চলে আসে। এইসব দেখতে আমাদের ভাল লাগে। এর বেশি কিছু না।'

'স্যারের মধ্যে কোন পাগলামি নেই। তাঁর একটা টেলিস্কোপ আছে। তিনি এই টেলিস্কোপ দিয়ে রাতের পর রাত তারা দেখেন।'

'এটাই কি পাগলামি না? তিনি নিশ্চয়ই এস্ট্রনমার না বা এসট্রো ফিজিসিস্ট না। হিসাব নিকাশ করছেন না, তারাদের গতিপথ বের করছেন না। শখের বসে আকাশ দেখছেন। সেটা তো একবার দেখলেই হয়। রাতের পর রাত হা করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার প্রয়োজন কি?'

রূপা হেসে ফেলল।

তানভির বিস্মিত হয়ে বলল, হাসছ কেন?

'আপনি কেমন রাগ করছেন তাই দেখে হাসছি। যে মানুষটিকে আপনি এখনো দেখেননি তাঁর উপর রাগ করছেন কেন?'

'তাঁর উপর রাগ করছি না। তোমার বিচার-বিবেচনা দেখে রাগ করছি। তোমাদের মত বয়েসী মেয়েদের এই সমস্যা। তারা অতি অল্পতেই অভিভূত। একজন হয়ত কবিতা লেখে। তার মাথা ভর্তি লম্বা চুল। ময়লা পাঞ্জাবী পরে উদাস মুখে ঘুরে বেড়ায়। তার একটি কবিতা না পড়ে শুধুমাত্র তাকে দেখেই তোমরা অভিভূত হয়ে যাবে। চোখ বড় বড় করে কাঁপা কাঁপা গলায় বলবে, কবি কবি।

রূপা খিলখিল করে হেসে ফেলল।

তানভিরও হাসল। হাসতে হাসতে বলল, লর্ড বায়রনের কথা তুমি জান কি-না জানি না। বড় কবি। ইংল্যান্ডের সব তরুণী কবিতা না পড়েই এই মানুষটার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিল। অথচ মানুষটা ছিলেন খোঁড়া, তিরিক্ষি মেজাজ। কেউ তাঁর দিকে তাকালেই রেগে যেতেন। তিনি বিয়ের দু'ঘণ্টা পর নববধূকে কাছে ডেকে বললেন, এ্যাই শোন, তোমাকে আমি কেন বিয়ে করেছি জান? তোমাকে আমি অসম্ভব ঘৃণা করি বলেই বিয়ে করেছি।

রূপা বলল, বায়রনের কোন কবিতা কি আপনার জানা আছে?

'না। তুমি পড়তে চাইলে জোগাড় করে দেব। অনেক দূর এসে পড়েছি বলে মনে হচ্ছে। আর কতক্ষণ?'

'ঐ যে ভাঙা বাড়িটা দেখছেন — ঐটা।'

তানভির বিস্মিত হয়ে বলল, ঐ বাড়ি তো যে কোন মুহূর্তে ভেঙে মাথার উপর পড়বে। কোন বুদ্ধিমান প্রাণী এই বাড়িতে বাস করতে পারে না। অসম্ভব।

তানভিরের কথা ভুল প্রমাণ করে ভাঙা বাড়ির ভেতর থেকে মবিনুর রহমান বের হয়ে এলেন এবং নিতান্তই সহজ গলায় বললেন, রূপা আস। যেন তিনি রূপার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

রূপা বলল, স্যার ইনি মেজো ভাইয়ের বন্ধু। আমাদের এখানে বেড়াতে এসেছেন। গ্রাম দেখতে বের হয়েছেন।

মবিনুর রহমান বললেন, আসুন, ভেতরে আসুন।

তানভির কিছু বলল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। রূপা বলল, স্যার আপনার নৌকাটা কি ঘাটে আছে?

'হ্যাঁ আছে।'

'আমরা আপনার নৌকায় বসে চা খাব। ঘরে চা পাতা আছে স্যার?

'আছে, চা পাতা আছে। তবে চিনি নেই। গুড় দিয়ে চা খেতে হবে। তোমরা নৌকায় গিয়ে বস, আমি চা বানিয়ে আনছি।'

'আপনাকে চা বানাতে হবে না স্যার। আমি বানাব। কোনটা কোথায় আছে আপনি শুধু দেখিয়ে দেবেন।'

রূপা চা বানাতে বসল। তানভির মবিনুর রহমানের পাশে একটা চৌকিতে বসল। সে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না। তার মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে বাড়ির ছাদ ভেঙে মাথায় পড়বে। তবে তারো আগে যে চৌকিতে বসেছে সেই চৌকিও ভেঙে টুকরো টুকরো হবে। মটমট শব্দ করছে।

তানভির বলল, রূপা বলছিল আপনি না-কি টেলিস্কোপ দিয়ে সারারাত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

মবিনুর রহমান নিচু গলায় বললেন, এটা আমার একটা শখ। তবে সবদিন দূরবীন নিয়ে বসি না। আকাশ যখন পরিষ্কার থাকে তখন বসি।

'কি দেখেন?'

'তারা দেখি।'

'একই তারা বার বার দেখতে ভাল লাগে?'

'জ্বি লাগে। তারা দেখি আর ভাবি।'

'কি ভাবেন?'

'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কি করে তৈরি হল তাই ভাবি।'

'আপনার এই ভাবনা তো পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই ভেবে রেখেছেন। বিগ বেংগ-এর ফলে ইউনিভার্সের সৃষ্টি।'

'এটা নিয়েই ভাবি। বিগ বেংগের আগে কি ছিল? অনন্ত শূন্য ছিল? যদি তাই থাকে তাহলে তো বিগ বেংগ-এর ফলে ইউনিভার্স সৃষ্টি হতে পারে না।'

'অসুবিধা কোথায়?'

'তাহলে ধরে নিতে হবে থার্মোডিনামিক্সের প্রথম সূত্র কাজ করছে না। তা তো হয় না। প্রকৃতি তার নিজের নিয়ম কখনো ভঙ্গ করে না।'

'আপনি তা কি করে জানেন?'

'কেন জানব না? আমিও তো প্রকৃতিরই অংশ।'

'আপনার দূরবীনটা কি খুব ভাল দূরবীন?'

'জ্বি। শনি গ্রহের বলয় পরিষ্কার দেখা যায়। এক রাতে সময় করে আসুন। আপনাকে দেখাব।'

'এখানে আসতে খুব ভরসা পাচ্ছি না। বাড়ির যা অবস্থা। যে কোন মুহূর্তে ছাদ মাথার উপর ভেঙে পড়বে বলে মনে হচ্ছে — তাছাড়া আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এ-বাড়িতে বিষাক্ত সাপ আছে। ভাঙা বাড়ি সাপদের খুব প্রিয়।'

মবিনুর রহমান সহজ গলায় বললেন, সাপ আছে ঠিকই। দুটো চন্দ্রবোড়া সাপ পাশের ঘরে থাকে।

'সাপ আপনি চেনেন? চন্দ্রবোড়া বুঝলেন কি করে?'

'অনুমানে বলছি। সব সাপ ডিম দেয়। এই সাপটা সরাসরি বাচ্চা দিয়েছে। একমাত্র চন্দ্রবোড়াই সরাসরি বাচ্চা দেয়। একত্রিশটা বাচ্চা দিয়েছে।'

'বসে বসে গুণেছেন?'

'জ্বি না। একদিন বারান্দায় বসে ছিলাম। দেখলাম, সাপটা বাচ্চাগুলি নিয়ে বের হয়েছে। তখন গুণলাম।'

'একত্রিশটা সাপের বাচ্চা এবং দু'টা সাপ নিয়ে বাস করতে আপনার ভয় লাগে না?'

'একটু লাগে। রাতে আমি ঘরে থাকি না। নৌকায় ঘুমাই। তবে আমার মনে হয় ভয়ের কিছু নেই। আমরা সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করেছি। আমি ওদের কিছু বলি না। ওরাও আমাকে কিছু বলে না। ওরা আমার গায়ের গন্ধ চেনে। আমিও ওদের গায়ের গন্ধ চিনি। আগেভাগেই সাবধান হয়ে যাই।'

চা তৈরি হয়ে গেছে। মবিনুর রহমান ফ্লাস্ক এনে দিলেন। ফ্লাস্ক ভর্তি চা নিয়ে তিনি নৌকায় রাত্রিযাপন করেন। তিনি লজ্জিত গলায় বললেন, খাবার-দাবার তো কিছু নেই রূপা। মুড়ি আছে। মুড়ি নিয়ে যাবে?

'হ্যাঁ, নিয়ে যাব। আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে।'

রূপা, তানভিরকে নিয়ে নৌকায় উঠে খুশি খুশি গলায় বলল, সুন্দর না?

তানভির বলল, অবশ্যই সুন্দর। নৌকায় বসে চা খাওয়ার এই আইডিয়া অসাধারণ আইডিয়া। আমরা রোজ এখানে আসব। নৌকা চালানো শিখে নেব।

'নদীতে কিন্তু খুব স্রোত।'

'হোক স্রোত। স্রোত কোন সমস্যা না।'

'গুড়ের চা কেমন লাগছে?'

'অসাধারণ লাগছে। এই পরিবেশে সবকিছুই অসাধারণ লাগে।'

'আমার স্যারকে আপনার কেমন লাগল?'

'ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার। তবে এই জাতীয় ক্যারেক্টার আমি আগেও দেখেছি। এরা কিছুটা অদ্ভুত। তবে যতটা না অদ্ভুত মানুষের কাছে তারা নিজেদের তার চেয়েও অদ্ভুত করে তুলে ধরে।'

রূপা বলল, স্যার সম্পর্কে আমি আপনাকে খুব-একটা গোপন কথা বলতে পারি। বলব?

'বল !'

'কাউকে কিন্তু বলতে পারবেন না। অসম্ভব গোপন কথা, পৃথিবীর কেউ জানে না। আমি কাউকে বলিনি। শুধু আপনাকে বলব, তবে কথা দিতে হবে আপনি কাউকে বলবেন না।'

'অবশ্যই আমি কাউকে বলব না।'

'কথাটা কি জানেন? স্যারকে আমি পাগলের মত পছন্দ করি। সব সময় আমি. উনার কথা ভাবি। রাতের পর রাত আমি ঘুমুতে পারি না। আমি ঠিক করেছি যে ভাবেই হোক তাঁকে বিয়ে করব। বাকি জীবন কাটিয়ে দেব তাঁর সেবা করে।'

তানভির অবাক হয়ে রূপার দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখ হয়েছে মাছের চোখের মত। চোখে পলক পড়ছে না।



রাতের খাবার দেয়া হয়েছে।

রূপা বলল, আমি আগে আগে খেয়ে নেব। আমার ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে। মিনু বলল, তুমি আমার সঙ্গে খাবে রূপা। সেকেণ্ড ব্যাচে।

'ভাবী তুমি তো খাও থার্ড ব্যাচে। রাত এগারোটা বাজে খেতে খেতে।'

'আজ তুমিও রাত এগারোটায় খাবে। এসো আমার ঘরে। তোমার সঙ্গে খুব জরুরী কিছু কথা আছে।'

'ক্ষিধেয় তো মরে যাচ্ছি ভাবী।'

মিনু গম্ভীর গলায় বলল, মানুষ এত সহজে মরে না রূপা।

রূপা মিনুর ঘরে ঢুকলো। ভাবী কি বলবেন তা সে আঁচ করতে পারছে। তানভির সব কিছুই প্রকাশ করেছে। সে নিশ্চয় জনে জনে বলেনি। প্রথমে বলেছে ভাইয়াকে, সেখান থেকে শুনেছে ভাবী, ভাবীর কাছ থেকে শুনেছে মা। মা'র কাছ থেকে বাবা। সবাই অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকে দেখছে। বাবা তখন থেকে বারান্দায় বসে আছেন। বাবার এমন গম্ভীর মুখ সে এর আগে কখনো দেখেনি।

মিনু ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। রূপা বলল, দরজা বন্ধ করছ কেন ভাবী?

'তোমার সঙ্গে যে-বিষয় নিয়ে কথা বলব আমি চাই না তা কেউ শুনুক, এই জন্যেই দরজা বন্ধ করছি। তুমি পা তুলে আরাম করে বিছানায় বস।'

রূপা তাই করল। মিনু বলল, তুমি তানভির সাহেবকে কি বলেছ?

'অনেক কিছুই তো বলেছি। তুমি কোনটা জানতে চাচ্ছ?'

'অনেক কিছু মানে কি?'

'অনেক কিছু মানে অনেক কিছু। আমি প্রচুর বকবক করেছি।'

'তুমি যে প্রচুর বকবক করেছ তা বুঝতে পারছি। বকবক করতে গিয়ে ভয়ংকর সব কথা বলেছ।'

'আমি কোন ভয়ংকর কথা বলিনি।'

'অবশ্যই বলেছ — তুমি কি বলনি যে ঘাটের মরা ঐ বুড়ো মাস্টার সাহেবের প্রেমে তুমি হাবুডুবু খাচ্ছ?'

'বলেছি।'

মিনু ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমি জানি তুমি ঠাট্টা করে বলেছ। আমিও তানভির সাহেবকে তাই বললাম। কিন্তু রূপা এই জাতীয় ঠাট্টা করা কি উচিত? তানভির সাহেব বুদ্ধিমান মানুষ। তাকে যখন বলেছি — রূপা ঠাট্টা করেছে, তিনি একসেপ্ট করেছেন। অন্য কেউ তো তা করবে না।

রূপা বলল, তোমাদের তানভির সাহেব মোটেই বুদ্ধিমান নন। বুদ্ধিমান হলে তিনি বুঝতে পারতেন আমি তাঁর সঙ্গে মোটেই ঠাট্টা করিনি।

'কি বলছ তুমি রূপা?'

'সত্যি কথা বলছি ভাবী।'

'সত্যি কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, সত্যি কথা বলছি।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ ভাবী মাথা খারাপই হয়েছে। আর কিছু বলবে?'

মিনু বলার মতো কিছু পেলো না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। রূপা বলল, তুমি কি আরো কিছু বলবে?

'বলব।'

'বল, আমি শুনছি . . .।

মিনু কিছু বলতে পারল না কারণ তার মাথা পুরোপুরি ঘুলিয়ে গেছে। মাথায় কোন কিছুই আসছে না। রূপাকে দেখে এখন তার মনে হচ্ছে কিছু বলে লাভ নেই। এই মেয়েটি এখন আর কিছুই শুনবে না। সে বাস করছে অন্য জগতে।

রূপা বলল, ভাবী, আমি এখন যাই। তুমি আমাকে কি বলবে ভেবে ঠিকঠাক করে রাখ। পরে শুনব।

বাইরের ঘরের বারান্দায় তানভির হাঁটাহাঁটি করছে। তার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। বারান্দা অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জ্বলন্ত সিগারেটের উঠানামা থেকে বোঝা যায় এখানে একজন মানুষ আছে যে বারান্দার এ-মাথা থেকে ও-মাথায় যাচ্ছে।

রূপা বারান্দায় এসে তীক্ষ্ণ গলায় ডাকল, একটু শুনে যান তো। তানভির এগিয়ে এল। রূপা বলল, আপনাকে বলেছিলাম কাউকে কিছু না বলতে। আপনি সবাইকে বলে বেড়িয়েছেন, তাই না?

তানভির বলল, বলা প্রয়োজন বোধ করেছি বলেই বলেছি।

'প্রয়োজন বোধ করলেন কেন?'

'ভয়ংকর কোন ভুল কেউ করতে গেলে তাকে ভুল দেখিয়ে দিতে হয়। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হয়।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ, তাই। তোমার বয়স কম। কাজেই তুমি বুঝতে পারছ না তুমি কি বলছ কিংবা কি করছ।'

'আপনার ধারণা আমি ভয়ংকর একটা ভুল করেছি?'

'অবশ্যই।'

'কেউ যদি ইচ্ছা করে ভুল করতে চায় তাকে কি ভুল করতে দেয়া হবে না?'

'না।'

'কোনটা ভুল কোনটা শুদ্ধ তা আপনি নিজে জানেন?'

'সব জানি না। তবে তোমার চেয়ে বেশি জানি।'

'আপনার বয়স আমার চেয়ে বেশি, তাই বেশি জানেন?'

'বয়স একটা ফ্যাক্টর তো বটেই।'

'যে গাধা সে আশি বছরেও গাধা থাকে, বয়স কোন ফ্যাক্টর না।'

'রূপা, আমি গাধা নই।'

'তা নন। তবে আপনি খুব বুদ্ধিমানও নন।'

'খুব বুদ্ধিমান নই তা কেন বলছ?'

'খুব যারা বুদ্ধিমান তারা তাদের বুদ্ধির ধার অন্যকে দেখাবার জন্যে ব্যস্ত থাকে না। অল্পবুদ্ধির মানুষরাই অন্যদের বুদ্ধির খেলা দেখাতে চায়। অন্যদের চমৎকৃত করতে চায়। বুদ্ধিমানরা তা চায় না। কারণ তারা জানে তার প্রয়োজন নেই।'

'আমি কি বুদ্ধির খেলা দেখাতে গিয়েছি?'

'অবশ্যই গেছেন। আপনার কিছু তৈরি গল্প আছে। যে সব গল্প বলে আপনি চমক লাগাবার চেষ্টা করেন। যেমন — মোনালিসার গল্প। গল্প বলার সাজ-সরঞ্জামও আপনার সঙ্গে থাকে। মানিব্যাগে থাকে ছোট্ট মোনালিসার ছবি। এই গল্প আমাদের বলার আগে আপনি শ' খানেক লোককে আগে বলেছেন। সবাই চমৎকৃত হয়েছে।'

'তুমি হওনি?'

'আমিও হয়েছিলাম। কিন্তু যেই মুহূর্তে আপনি মানিব্যাগ থেকে ছবি বের করলেন সেই মুহূর্তেই বুঝলাম মানুষ হিসেবে আপনি খুবই সাধারণ।'

'তোমার ঐ স্যার বুঝি মানুষ হিসেবে অসাধারণ?'

'হ্যাঁ। আমার কাছে অসাধারণ।'

'তোমার কাছে অসাধারণ হলেই সে মানুষ হিসেবে অসাধারণ হবে? আমার তো ধারণা সে এভারেজ ইন্টেলিজেন্সের একজন মানুষ। দূরবীন নিয়ে কিছু কায়দা-কানুন করছে যা দেখে তোমরা চমৎকৃত হচ্ছ।'

রূপা চুপ করে রইল। যদিও তার ইচ্ছা করছে কঠিন কিছু কথা বলে লোকটিকে ধুলায় মিশিয়ে দেয়। কিছু মনে পড়ছে না। তানভির হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে আরেকটি ধরাল। তার ভাবভঙ্গিতে আগের অস্থিরতা নেই। তবে রূপা মেয়েটিকে এখন সে আগের মত তুচ্ছ বালিকা হিসেবে অগ্রাহ্য করছে না। সে বুঝতে পারছে এই মেয়েটির সঙ্গে সাবধানে কথা বলতে হবে।

'রূপা।'

'জ্বি।'

'পাড়াগাঁয় যারা থাকে তাদের জীবন মোটামুটি নিস্তরঙ্গ। বড় ধরনের কিছু চারপাশে ঘটে না। দূরবীন নিয়ে কেউ উপস্থিত হলে তাকেই মনে হয় গ্যালিলিও। আসলে তার প্রতিভা হয়ত ঐকিক নিয়মে ভাল অংক করায় সীমাবদ্ধ। কাউকে স্পেসিফিক্যালি মীন করে আমি বলছি না। তুমি রাগ করো না।'

'আমি রাগ করছি না। ব্যাপারটা সত্যি হলে রাগ হত। সত্যি না বলেই রাগের বদলে হাসি পাচ্ছে।'

'তোমার স্যার সম্পর্কে আমি এমন একটা কথা জানি যা শুনলে তুমি হয়ত রাগ করবে।'

'বলুন।'

'শুনেছি তিনি গম চুরি করেছেন। স্কুলের বরাদ্দ একশ মণ গম লোপাট করে দিয়েছেন। তার নামে কেইস হয়েছে।'

'কে বলেছে আপনাকে?'

'এটা কোন গোপন ব্যাপার না। আমি তোমার বাবার কাছ থেকেই শুনেছি।'

'তিনি আপনাকে কখন বললেন, আজ?'

'হ্যাঁ।'

'বাবা খুব ভাল করেই জানেন এটা মিথ্যা। তার পরেও তিনি এটা আপনাকে কেন বলেছেন তা কি আপনি বুঝতে পারছেন?'

'না।'

'জানি বুঝতে পারবেন না। কারণ আপনার এত বুদ্ধি নেই। যদি আপনার খানিকটা বুদ্ধি থাকতো তাহলে আপনি বুঝে ফেলতেন যে বাবা এটা আপনাকে বলেছেন যাতে আপনার সব রাগ গিয়ে ঐ মানুষটার উপর পড়ে। যাতে আপনি ভাবতে শুরু করেন যে সব দোষ ঐ চোর মানুষটার। রূপা নামের মেয়েটার কোন দোষ নেই।'

তানভিরের বিস্ময়ের সীমা রইল না। রূপা মেয়েটি তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। গ্রামে বড় হওয়া বাচ্চা একটা মেয়ে এমন গুছিয়ে কথা বলছে — আশ্চর্য!

তানভির বলল, এই চেয়ারটায় বস রূপা। মেজাজ ঠাণ্ডা কর, তারপর কথা বলি।

রূপা বলল, আমার মেজাজ খুব ঠাণ্ডা আছে। কেন আমার মেজাজ এত ঠাণ্ডা তা জানেন?

'না।'

'একদিন না একদিন এ-রকম একটা ব্যাপার ঘটবে তা আমি জানতাম। একদিন সবাই জানবে। তুমুল হৈচৈ শুরু হবে। মা ক্রমাগত কাঁদতে থাকবেন। বাবা স্তম্ভিত হয়ে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে থাকবেন। এটা আমি জানতাম। এই ঘটনার জন্যে আমার মানসিক প্রস্তুতি ছিল বলেই আমি এত সহজভাবে সব কিছু নিতে পারছি।'

তানভির বলল, আমি তাই দেখছি। এবং খানিকটা বিস্মিতও হচ্ছি। তোমার স্যার অসাধারণ কি না জানি না, তবে তুমি অসাধারণ।'

রূপা বারান্দা থেকে চলে এল। আসলেই তার প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে। মনে হচ্ছে এখনো কেউ খায়নি। আজ রাতে কি এ-বাড়িতে খাওয়া হবে না? রূপা রান্নাঘরে ঢুকল। রূপার মা রান্নাঘরে মোড়ায় একা একা বসে আছেন। রূপা বলল, প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে মা। আমাকে ভাত দিয়ে দাও। আজ কি রান্না?

রূপার মা দীর্ঘ সময় মেয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, বৌমা যা বলল তা-কি সত্যি মা?

'হ্যাঁ, সত্যি। এখন তোমরা কি করবে? বটি দিয়ে কুপিয়ে আমাকে কুচি কুচি করে নদীতে ফেলে দেবে?'

রূপার মা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, তুই ঠিক করে বল্‌তো মা ঐ হারামজাদা মাস্টার কি তোর গায়ে হাত দিয়েছে?

রূপা শান্ত গলায় বলল, তুমি আমাকে ছোট করতে চাও, কর। কিন্তু মা উনাকে ছোট করবে না। উনি এসব কিছুই জানেন না।'

রূপার মা কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতে ভাঙা গলায় বললেন, হারামজাদা জানে না মানে? হারামজাদা ঠিকই জানে। জেনেশুনে সে তোকে জাদু করেছে। তুই হচ্ছিস গাধার গাধা। মহা গাধা। তুই কিছুই বুঝতে পারিসনি। তোর বাবা ভয়ংকর রাগ করেছে। সে ঐ ছোটলোকটাকে এমন শাস্তি দেবে যে সে তার বাপ-মার নাম ভুলে যাবে।

'কি শাস্তি দিবে? খুন করবে?'

'কথা বলিস না তো। তোর কথা শুনে রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। তুই যা আমার সামনে থেকে।'

তিনি শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন। রূপা নিজের ঘরে চলে এল। তার অসম্ভব ভয় লাগছে। বাবা মাস্টার সাহেবকে শাস্তি দেবেন এটা নিশ্চিত। তার অপরাধে শাস্তি পাবে অন্য একজন। কি শাস্তি কে জানে? মেরে ফেলবেন না নিশ্চয়ই। মানুষ এত নিচে

নামতে পারে না। চেষ্টা করেও পারে না। স্কুলের চাকরি চলে যাবে। তাঁকে নীলগঞ্জ ছেড়ে চলে যেতে হবে। এটা হলে শাপে বর হয়। সেও স্যারের সঙ্গে চলে যেতে পারে। অনেক দূরে কোথাও। যেখানে কেউ তাকে চিনতে পারবে না। কেউ না।

মিনু এসে ডাকল, খেতে আস রূপা।

রূপা বলল, ক্ষিধা মরে গেছে ভাবী। তোমরা খাও। আমি কিছু খাব না।

'তোমার ভাই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছে, খেয়ে আমাদের ঘরে আস।'

'আমি এখন কারো সঙ্গেই কথা বলব না ভাবী। আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। আমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকব।'

'তোমার ভাই কিন্তু রাগ করবে।'

'রাগ যা করার করেছে। এখন দেখা করতে গেলেও সেই রাগের উনিশ-বিশ হবে না। আমি সকালে কথা বলব।'

আফজাল সাহেব রাত এগারোটায় ভাত না খেয়েই জুতা জামা পরে ঘর থেকে বেরুলেন। রফিক জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি জবাব দেন নি। কথা বলার মত মানসিক অবস্থা এখন তাঁর নেই। রফিক বলল, আমি কি সঙ্গে আসব বাবা?

তিনি হ্যাঁ-না কিছু বললেন না।

রফিক সঙ্গে চলল। বাবা প্রচণ্ড রেগে আছেন। তাঁর হাই ব্লাড প্রেসার। এরকম অবস্থায় তাঁকে একা ছাড়া উচিত না। তাছাড়া আকাশের অবস্থা ভাল না। যেভাবে মেঘ ডাকছে তাতে মনে হয় ঝড়-টর হবে।

রাস্তায় নেমেই রফিক বলল, যাচ্ছেন কোথায় বাবা?

'থানায় যাচ্ছি।'

'থানায়?'

'হুঁ। ওসি সাহেবকে বলব, ঐ শুওরের বাচ্চা.কে কাল যেন কোমরে দড়ি বেঁধে হাজতে নিয়ে ঢোকায়। নীলগঞ্জের সমস্ত মানুষ যেন তা দেখে।'

'ওসি সাহেব কি এটা করবেন?'

'অবশ্যই করবে। থানার বড় সাহেবরা যে কোন অন্যায় আগ্রহ নিয়ে করে। আর এটা কোন অন্যায় না। ব্যাটার বিরুদ্ধে কেইস আছে। গম চুরির কেইস।'

'রফিক বলল, হাজতে নিয়ে ঢুকানোর আইডিয়াটা মন্দ না বাবা। রূপা যদি শুনে চুরির অপরাধে ব্যাটাকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাহলে তার মোহভঙ্গ হতে পারে।'

'মোহভঙ্গ হোক আর না হোক, হারামজাদার বিষদাঁত আমি ভেঙে দেব। ন্যাংটা করে সারা নীলগঞ্জ আমি তাকে ঘুরাব। কুত্তা লেলিয়ে দেব। আমি খেজুরের কাঁটা দিয়ে ঐ কুত্তার চোখ গেলে দিব।'

'এত উত্তেজিত হবেন না বাবা। আমরা ঠাণ্ডা মাথায় পুরো ব্যাপারটা ট্যাকল করব। খুব ঠাণ্ডা মাথায়।'

রূপা ঘুমুতে গেল বৃষ্টি নামার পর। ঝুম বৃষ্টি নেমেছে। মনে হচ্ছে পৃথিবী ধুয়ে-মুছে যাবে। রূপেশ্বর নদীতে এবার বান ডাকবে। নিশ্চয়ই ডাকবে। ভাবতেই রূপার ভাগল লাগছে। ডাকুক, ভয়াবহ বান ডাকুক। নীলগঞ্জ ধুয়ে-মুছে যাক রূপেশ্বরের জলে।

বাতি নেভাতেই জেবা ডাকল, ফুপু।

রূপা বলল, হুঁ।

'বাড়িতে এখন দু'টা দল হয়ে গেছে।'

'হুঁ, হয়েছে।'

'তোমার এক দল আর বাকি সবার দল।'

রূপা কিছু বলল না। আসলে কোন কিছুই সে শুনছে না। প্রচণ্ড জ্বরের সময় যেমন হয় এখন তার তাই হচ্ছে। কোন কথা পরিষ্কার তার মাথায় ঢুকছে না। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। একটু যেন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। চোখ জ্বালা করছে।

জেবা বলল, ওদের দলে এত মানুষ আর তোমার দলে আছি শুধু আমি। দু'জনের দল — তাই না ফুপু?

'হুঁ।'

নদীর দিক থেকে শোঁ-শোঁ শব্দ আসছে। রাত যত বাড়ছে শব্দ ততই স্পষ্ট হচ্ছে।

রূপা বিছানায় উঠতে উঠতে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, এ বছর রূপেশ্বর নদীতে বান ডাকবে।

'বান ডাকলে কি তুমি খুশি হও ফুপু?'

'হ্যাঁ হই। সব জলের তোড়ে ভেসে গেলে খুশি হই।'

জেবা হাসল। খিলখিল হাসি। অন্ধকারে তার হাসি অদ্ভুত শোনাল। মনে হচ্ছে সে হাসি যেন কলকল শব্দে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

'ফুপু!'

'ফুপু ফুপু করবি না তো। ঘুমো।'

'একটা কথা বলেই ঘুমিয়ে পড়ব। কথাটা হচ্ছে — কাল সকালটা তোমার জন্যে খুব কষ্টের হবে। খুব কষ্টের। তবে আমি তো তোমার সঙ্গে থাকব। তুমি সেই কষ্ট সহ্য করতে পারবে।'

'তোমার কথার আগা-মাথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না জেবা। তুমি কি সব সময় এ-রকম পাগলের মত কথা বল?'

'আমি কোনদিনই পাগলের মত কথা বলি না। কিন্তু সবাই মনে করে আমি পাগলের মত কথা বলি।'

'ঠিক আছে, তুমি ঘুমাও।'

'ফুপু!'

'আর একটা কথাও না। ঘুমাও তো।'

'আমি কি আমার একটা হাত তোমার গায়ে রাখতে পারি?'

'না।'

'আচ্ছা আমি ঘুমুচ্ছি। তুমি ঘুমাও।'

'আমার ঘুম আসবে না।'

'আসবে। এক্ষুণি আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেব।'

রূপা শুয়েছে। বৃষ্টির জন্যেই একটু শীত শীত লাগছে। গায়ে পাতলা চাদর দিতে পারলে ভাল হত। আলসি লাগছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। ঘুমের মধ্যেই রূপা শুনতে পাচ্ছে, জেবা বলছে — দেখলে ফুপু, আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি। ঘুম! ঘুম!!



নীলগঞ্জ এমনই এক জায়গা যেখানে কখনো নাটকীয় কিছু ঘটে না। কারো বড়শিতে বড় মাছ ধরা পড়লে অনেক দিন সেই মাছ ধরার গল্প হয়। আসরে গল্প হিসেবে মাছের প্রসঙ্গ আসে — ধরেছিল একটা মাছ, পুব পাড়ার নীল মাধব। একটা জিনিসের মত জিনিস . . .

সেই নীলগঞ্জে আজ ভোরবেলা ভয়াবহ এক নাটক হচ্ছে। অচিন্ত্যনীয় একটা ঘটনা ঘটছে। নীলগঞ্জের মানুষ এতই হকচকিয়ে গেছে যে কিছু বলতে পারছে না। পাশের জনকে ফিসফিসিয়েও কিছু বলছে না। দৃশ্যটা হজম করতে সবারই সময় লাগছে। তারা অবাক হয়ে দেখছে নীলগঞ্জ স্কুলের স্যার মবিনুর রহমানকে কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে। সবার আগে যাচ্ছেন ওসি সাহেব। তাঁর চোখে সানগ্লাস। সানগ্লাস থাকার কারণে তাঁর মুখের ভাব কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কোমরের দড়ি ধরে যে পুলিশটি যাচ্ছে তাকে খুব বিমর্ষ মনে হচ্ছে। সে হাঁটছে মাথা নিচু করে। মবিনুর রহমানের পেছনেও দু'জন পুলিশ। তারাও মাথা নিচু করে হাঁটছে।

মবিনুর রহমানকে অত্যন্ত বিস্মিত মনে হচ্ছে। এই গরমেও তিনি একটা কোট গায়ে দিয়েছেন। তাঁর হাতে টেলিস্কোপের বাক্সটা আছে। বাক্সটা কিছুক্ষণ পর পর এ-হাত থেকে ও-হাতে নিচ্ছেন।

ওসি সাহেব মবিনুর রহমানকে বললেন, সিগারেট খাবেন?

মবিনুর রহমান বললেন, জ্বি না।

ওসি সাহেব বললেন, আপনার ঐ টেলিস্কোপটা কনস্টেবলের হাতে দিয়ে দিন। হাঁটতে আপনার কষ্ট হচ্ছে।

'কষ্ট হচ্ছে না। এর ওজন বেশি না। থ্রি পয়েন্ট টু কেজি।'

'সাবধানে পা ফেলুন, ভীষণ কাদা।'

ওসি সাহেবরা আসামীদের সঙ্গে এই ভঙ্গিতে কথা বলেন না, বিশেষত যে আসামীকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যেতে হয়। এই আসামীর বেলায় তিনি কিছু

ব্যতিক্রম করেছেন। শুরুতেই 'আপনি' বলে ফেলেছেন। শুরুতে 'আপনি' না বললে এই যন্ত্রণা হত না।

এই লোকটা গম চুরির সঙ্গে জড়িত না তা তিনি বুঝতে পারছেন। এটা বোঝার জন্যে এগারো বছর ধরে ওসিগিরি করতে হয় না। লোকটাকে কায়দা করে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। আগে মনে হচ্ছিল পুরো ব্যাপারটার পেছনে আছে হেড মাস্টার হাফিজুল কবির। এখন মনে হচ্ছে আরো অনেকেই আছে। বিশেষ করে আফজাল সাহেব আছেন।

একটা নিরপরাধ লোককে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আফজাল সাহেবের কারণে। তিনি বিশেষ করে বলে দিয়েছেন যেন কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার বাড়ির সামনে দিয়ে নেয়া হয়।

আফজাল সাহেব এই অঞ্চলের অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ। এদের কথা শুনতে হয়। না শুনলে এ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালানো যায় না। বড়দারোগাগিরি সহজ জিনিস নয়। অনেকের মন রেখে চলতে হয়। এমন সব কাজ করতে হয় যার জন্যে মন ছোট হয়ে যায়।

ওসি সাহেব নিজের অস্বস্তি দূর করবার জন্যেই বললেন — আপনার এই যন্ত্র দিয়ে গ্রহ-নক্ষত্র সব দেখা যায়?

মবিনুর রহমান আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন, সব দেখা না গেলেও অনেক দেখা যায়। যেমন ধরুন শনি গ্রহের বলয় দেখা যায়।

'দেখতে কেমন?'

'অপূর্ব।'

ওসি সাহেব আগ্রহের সঙ্গে বললেন, জিনিসটা একবার দেখলে হয়।

মবিনুর রহমান বললেন, টেলিস্কোপ সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। আকাশ পরিষ্কার থাকলে আপনাকে দেখাব।

ওসি সাহেব লজ্জিত বোধ করছেন। মানুষটা তো অদ্ভুত। তার কোমরে ধরি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে আর সে কি-না বলছে তাকে টেলিস্কোপে শনি গ্রহের বলয় দেখাবে। মানুষটাকে এ্যারেস্ট করতে গিয়েও বিপত্তি। কাউকে এ্যারেস্ট করে নিয়ে আসা এমন কোন মজাদার বিষয় নয়। বিশেষ করে যখন জানা থাকে লোকটা নিরপরাধ। হম্বিতম্বি তখনি বেশি করতে হয়। নিরপরাধ লোকের মনেও এই বিশ্বাস ধরিয়ে দিতে হয় যে সে আসলে নিরপরাধ না। কোন একটা অপরাধ তার আছে যা সে নিজে তেমন ভাল জানে না। ওসি সাহেবও তাই করলেন। ভয়ংকর মূর্তিতে উপস্থিত হলেন। খসখসে গলায় বললেন, ইউ আর আণ্ডার এ্যারেস্ট।

ভদ্রলোক চায়ের পানি গরম করছিলেন। বিস্মিত গলায় বললেন, কেন বলুন তো?

'গম চুরির মামলা — মিস এপ্রোপ্রিয়েশন অব প্যাবলিক ফান্ড। নব্বই বস্তা গম আপনি চুরি করেছেন।'

'নব্বই বস্তা গম দিয়ে আমি কি করব?'

'আমার সঙ্গে কি রসিকতা করার চেষ্টা করছেন? নব্বই বস্তা গম দিয়ে আপনি কি করবেন তা জানেন না? স্ট্রেইট কথা বলুন। বাঁকা কথা বলবেন না।'

'বাঁকা কথা কি বললাম বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে না পারলে কথা বলবেন না। শুধু প্রশ্ন করলেই জবাব দেবেন। নট বিফোর দ্যাট।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আপনার ঘরও সার্চ হবে। সার্চ ওয়ারেন্ট আছে। পাশের ঘরে কি আছে?'

'দু'টা চন্দ্রবোড়া সাপ আছে আর তাদের একত্রিশটা ছানা আছে। সাবধানে যাবেন।'

ওসি সাহেবের রাগে গা জ্বলে গেল। লোকটিকে সাদাসিধা ভালমানুষ মনে হয়েছিল, আসলে সে তা না। খাকি পোশাকের সঙ্গে রসিকতা করতে চায়। যারা খাকি পোশাকের সঙ্গে রসিকতা করতে চায় তাদেরকে চোখে চোখে রাখতে হয়। বুঝিয়ে দিতে হয় যে খাকি পোশাক রসিকতা পছন্দ করে না।

'কি বললেন? চন্দ্রবোড়া সাপ?'

'জ্বি।'

'ভেরি গুড। আমার কিছু চন্দ্রবোড়া সাপই দরকার।'

ওসি সাহেব নিজেই দরজা খুললেন এবং ছিটকে বের হয়ে এলেন। দু'টি চন্দ্রবোড়ার একটি তিনি দেখতে পেয়েছেন। সেই দৃশ্য খুব সুখকর নয়। তখনই তিনি ঠিক করেছেন এই আসামীর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে হবে। মবিনুর রহমান যখন বললেন, আমি কি আমার দূরবীনটা সঙ্গে নিতে পারি?

ওসি সাহেব তৎক্ষণাৎ বললেন, অবশ্যই পারেন। অবশ্যই। সঙ্গে আরো কিছু নিতে চাইলে তাও নিতে পারেন।

'না, আর কিছু না। হাজতে কি আমাকে দীর্ঘ দিন থাকতে হবে?'

'এখন বলা যাচ্ছে না। নির্ভর করে . . .'

'কিসের উপর নির্ভর করে?'

ওসি সাহেব তার জবাব দিলেন না। তাঁর মন বলছে এই লোকটির সঙ্গে বেশি কথাবার্তায় যাওয়া ঠিক হবে না।

রাস্তায় লোক জমছে। তারা অবাক হয়ে মবিনুর রহমানকে দেখছে। মবিনুর রহমান তাদের দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন। তাঁর সেই তাকানোয় লজ্জা-সংকোচ কিছুই নেই। বিব্রত একটা ভঙ্গি আছে, এর বেশি কিছু না।

কালিপদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে বালতি ভর্তি পানি নিয়ে স্কুলের দিকে যাচ্ছিল। পুলিশের দল দেখে থমকে দাঁড়াল। উঁচু গলায় বলল, কি হইছে? মবিনুর রহমান বললেন, কেমন আছ কালিপদ?

'আপনেরে কই নিয়া যায়?'

'থানায় নিয়ে যাচ্ছে।'

'কেন?'

'আমার বিরুদ্ধে গম চুরির কেইস আছে।'

কালিপদ বালতি নামিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। পরবর্তী এক ঘণ্টা সে তার জায়গায় বসেই রইল, নড়ল না।

পুলিশের দলটা থামল আফজাল সাহেবের বাড়ির সামনে। ওসি সাহেব বাড়ির গেট খুলে বাইরের বারান্দায় ঢুকলেন এবং গম্ভীর গলায় ডাকলেন, আফজাল সাহেব আছেন?

আফজাল সাহেব বের হয়ে এলেন।

ওসি সাহেব বললেন, এক গ্লাস পানি খাওয়াতে পারেন?

'এদিকে কোথায় এসেছিলেন?'

'আসামী নিয়ে থানায় যাচ্ছি।'

'বসুন চা খেয়ে যান।'

'চা অবশ্যি এক কাপ খাওয়া যেতে পারে।'

ওসি সাহেব পুলিশের দলটির দিকে তাকিয়ে বললেন, এ্যাই, তোমরা একটু দাঁড়াও। পুলিশের দল মবিনুর রহমানকে নিয়ে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

এ-রকমই কথা ছিল। আফজাল সাহেব বলে দিয়েছিলেন কোমরে দড়ি-বাঁধা অবস্থায় মবিনুর রহমানকে গেটের বাইরে দাঁড়া করিয়ে ওসি সাহেব তাঁর বাড়িতে চা নাশতা খাবেন।

ওসি সাহেব এই কাজটিই এখন করছেন। তবে কাজটি করতে তাঁর খুব ভাল লাগছে না। লোক জমছে। অনেক মানুষ জড়ো হয়ে গেছে। মানুষ বেশি জমলেই তারা এক সঙ্গে এক জাতীয় চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। যার নাম 'মব সাইকোলজি'। এই চিন্তা হঠাৎ কোন দিকে যাবে বলা মুশকিল। জড়ো হওয়া মানুষগুলি যদি মনে করে কাজটা অন্যায় হয়েছে তাহলে মুহূর্তের মধ্যে ক্ষেপে যাবে। ক্ষেপা জনতা — ভয়ংকর।

রূপা বারান্দায় এসে শান্ত চোখে দৃশ্যটা দেখল। একবার মবিনুর রহমানের দিকে তাকিয়ে সে তাকাল তার বাবার দিকে। তারপর তাকাল ওসি সাহেবের দিকে।

ওসি সাহেব বললেন, আপনার মেয়ে?

আফজাল সাহেব বললেন, জ্বি। এর নাম রূপা।

ওসি সাহেব বললেন, কেমন আছ মা?

রূপা বলল, ভাল আছি। আপনি স্যারকে কোমরে দড়ি বেঁধে আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়া করিয়ে রেখেছেন কেন?

'আসামীকে থানায় নিয়ে যাওয়ার এইটাই পদ্ধতি। আসামী যে-ই হোক না কেন তাকে হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যেতে হবে।'

'স্যারের বাড়ি থেকে থানায় যাবার রাস্তা তো এটা না। আপনি অনেকখানি ঘুরে আমাদের বাড়ির সামনে এসেছেন। কেউ নিশ্চয়ই এই কাজটা করার জন্যে আপনাকে বলেছে। তাই না?'

ওসি সাহেব আফজাল সাহেবের দিকে তাকালেন।

আফজাল সাহেব কড়া গলায় বললেন, ভেতরে যাও রূপা।

রূপা কয়েক মুহূর্ত বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে ভেতরে চলে গেল।

বাড়ির সামনে লোক বাড়ছে।

ওসি সাহেব চা শেষ না করেই উঠে পড়লেন। ব্যাপারটা আর ভাল লাগছে না। এত লোক জমছে কেন?

মবিনুর রহমানকে হাজতে ঢোকানোর তিন ঘণ্টার ভেতর থানার চারপাশে দু'তিন হাজার মানুষ জমে গেল। তারা হৈচৈ, চিৎকার কিছুই করছে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সবাই শান্ত। এই লক্ষণ ভাল না। খুব খারাপ লক্ষণ। এরা থানা আক্রমণ করে বসতে পারে। থানায় আগুন লাগিয়ে দিতে পারে। থানায় টেলিফোন আছে — অতিরিক্ত ফোর্স চেয়ে টেলিফোন করা যায়। কিন্তু টেলিফোন গত এক সপ্তাহ থেকে নষ্ট।

ওসি সাহেব থানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বললেন, আপনারা সরকারী কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছেন। এর ফলাফল ভাল হবে না। আমরা আসামী ধরে এনেছি। আসামীকে কোর্টে চালান করে দেব। সেখান থেকে জামিন হবে। যান, আপনারা বাড়ি চলে যান। ভীড় বাড়াবেন না।

কেউ নড়ল না।

দুপুর গড়িয়ে গেল। মানুষ বাড়তেই থাকল।

ওসি সাহেব সেকেণ্ড অফিসারকে বললেন হেড অফিসে খবর দিতে। আসামীকে ছেড়ে দিলে এখন কোন লাভ হবে না। হিতে বিপরীত হবে। লোকজন থানায় আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। এই রিস্ক নেয়া যায় না।

সেকেণ্ড অফিসার সাহেব থানা ছেড়ে বেরুতে গেলেন, লোকজন তাঁকে ঘিরে ফেলল। নিরীহ গলায় বলল, স্যার কোথায় যান?

'তা দিয়ে আপনি কি করবেন?'

'যেতে পারবেন না স্যার।'

'যেতে পারব না মানে? এটা কি মগের মুল্লুক নাকি?'

সেকেণ্ড অফিসার ভয়াবহ পুলিশী গর্জন দিতে গিয়েও থেমে গেলেন। লোকজন কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। এই দৃষ্টির সঙ্গে তিনি পরিচিত। এই দৃষ্টির নাম — – উন্মাদ দৃষ্টি।

জেবা চা খাচ্ছে। পিরিচে করে চা খাচ্ছে।

পিরিচ ভর্তি চা নিয়ে চুকচুক করে চুমুক দিচ্ছে। তাকে কেন জানি খুব আনন্দিত মনে হচ্ছে। রূপা ঘরে ঢুকে জেবাকে দেখল। জেবা বলল, ফুপু আমি চা খাচ্ছি। বলেই খিলখিল করে হাসল। চা খাওয়ার মধ্যে হাসির কি আছে রূপা বুঝতে পারছে না। আসলে এখন সে কিছুই বুঝতে পারছে না। তার কাছে সবই এলোমেলো হয়ে গেছে।

'ফুপু।'

'কি?'

'তুমি চিন্তা করবে না ফুপু, আমি তোমার দলে।'

'আমি কোন চিন্তা করছি না। আর শোন, আমি কোন দল করছি না।'

'তোমার স্যারকে নিয়েও তুমি চিন্তা করবে না। আমি ব্যবস্থা করছি।'

'তুমি ব্যবস্থা করছ মানে?'

'সব মানুষ ক্ষেপে যাবে। ওরা থানা আক্রমণ করবে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবে। সাংঘাতিক মজার ব্যাপার হবে।'

'কি বলছ তুমি?'

'আমি কোন মিথ্যা কথা বলি না ফুপু। সন্ধ্যার মধ্যে ভয়ংকর কাণ্ড শুরু হবে।'

জেবা হাসল খিলখিল করে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে খুব আনন্দিত।

নীলগঞ্জ থানার ওসি সাহেব অস্থির বোধ করছেন। দুপুরে তিনি বাসায় ভাত খেতে যাননি। শুধু তিনি কেন, থানার কেউই দুপুরে খায়নি। সেপাইদের সবাইকে রাইফেল হাতে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। ওসি সাহেব বিপদের ঘ্রাণ পাচ্ছেন। মানুষ ক্রমেই বাড়ছে। এখন মনে হচ্ছে দূর দূর থেকে মানুষ আসছে। অনেকের হাতেই বর্শা। বর্শা হল এ-অঞ্চলের যুদ্ধাস্ত্র যার স্থানীয় নাম অলংগা। কারো কারো হাতে লম্বা বাঁশের লাঠিও আছে। এখনো সন্ধ্যা হয়নি কিন্তু অনেকেই হারিকেন নিয়ে এসেছে। মনে হয় তাদের সারারাত জেগে থাকার পরিকল্পনা। ওসি সাহেব মবিনুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। হাজতের দরজা খুলতেই মবিনুর রহমান বিস্মিত গলায় বললেন, এত লোক কেন চারদিকে?

ওসি সাহেবের প্রথমেই মনে হল, ব্যাটা সব জেনেশুনে ঠাট্টা করছে। পরমুহূর্তেই মনে পড়ল এই লোক মিথ্যা বলে না। ঠাট্টাও করে না। চন্দ্রবোড়া সাপ নিয়ে সত্যি কথাই বলেছিল।

মবিনুর রহমান আবার বললেন, এত লোক কেন?

ওসি সাহেব ভুরু কুঁচকে বললেন, জানি না। আপনি কি চা খাবেন?

'জ্বি-না।'

'সিগারেট? সিগারেট লাগবে? আনিয়ে দেব?'

'জ্বি-না।'

ওসি সাহেব কথা বলার আর কিছু পেলেন না। নিজের অফিস ঘরের দিকে ফিরে চললেন। লোক আরো বাড়ছে। দ্রুত কোন-একটা বুদ্ধি বের করে এদের দূর করতে হবে। ভয় দেখিয়ে দূর করা যাবে না। একা মানুষ ভয় পায়। জনতা ভয় পায় না। মবিনুর রহমানকে ছেড়ে দিলেও কোন লাভ হবে না। এরা তাহলে নিজেদের বিজয়ী ভাববে। বিজয়ী মানুষদের জয় উল্লাসও ভয়াবহ হয়ে থাকে। আনন্দেই এরা হয়ত থানা জ্বালিয়ে দেবে। এমন কিছু করতে হবে যাতে মবিনুর রহমানের কোমরে দড়ি বেঁধে হাজতে নিয়ে আসা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কিভাবে তা সম্ভব? অতি দ্রুত কিছু ভেবে বের করতে হবে। অতি দ্রুত। এমন কিছু বলতে হবে যাতে সবাই বলে কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় আনার প্রয়োজন ছিল।

ওসি সাহেব তাঁর অফিসে ঢুকেই দেখলেন, নীলগঞ্জ হাই স্কুলের ধর্ম শিক্ষক জালালুদ্দিন বসে আছেন। জালালুদ্দিন সাহেবের মুখ অতিরিক্ত গম্ভীর।

'কেমন আছেন জালালুদ্দিন সাহেব?'

'জ্বি – জনাব ভাল। আপনার কাছ থেকে একটা বিষয় জানতে এসেছি।'

'অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। এর মধ্যে কি জানতে চান?'

'অবস্থা সম্পর্কেই একটা প্রশ্ন। মবিনুর রহমান সাহেবকে আপনারা কোমরে দড়ি বেঁধে হাজতে এনেছেন। কি জন্যে এনেছেন? গম চুরির একটা মিথ্যা মামলার কারণে না অন্য কিছু?'

'অন্য কিছু।'

'বলুন শুনি।'

ওসি সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন — অন্য ব্যাপার। সামান্য কারণে তাঁর মত লোককে তো এভাবে থানায় আনা যায় না। পুলিশ হয়েছি বলে তো আর আমরা অমানুষ না। মানী লোকের মান আপনারা যেমন বুঝেন আমরাও বুঝি। উনার বিরুদ্ধে অসামাজিক কার্যকলাপের গুরুতর অভিযোগ আছে।

'কি বললেন?'

ওসি সাহেব নিজেকে গুছিয়ে নেবার জন্যে কিছুটা সময় নিলেন। সিগারেট ধরালেন। সুন্দর একটা গল্প ফাঁদতে হবে। বিশ্বাসযোগ্য গল্প। সিগারেট টানতে টানতে কঠিন মুখে বললেন — একটা রেপ কেইস হয়েছে। ভিকটিমের জবানবন্দি অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি।

'রেপ কেইস?'

'জ্বি, রেপ কেইস। এই কারণেই কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় এনেছি।'

জালালুদ্দিন হতভম্ব মুখে তাকিয়ে আছেন।

ওসি সাহেব এই হতভম্ব দৃষ্টি দেখে খানিকটা সান্ত্বনা পেলেন। মনে হচ্ছে কাজ হবে। জালালুদ্দিন যখন তাঁর কথায় হকচকিয়ে গেছে তখন অন্যরাও যাবে। এই ঘটনায় লোকজন বুঝবে কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় আনা উচিত ছিল। বাতাস ঘুরে যাবে। মবের চিন্তা-ভাবনা একদিক থেকে অন্যদিকে অতি দ্রুত ঘুরতে পারে। এখন যা করতে হবে তা হচ্ছে মামলা সাজানো। একটা মেয়ে জোগাড় করতে হবে, যে হবে ফরিয়াদী। তেমন মেয়ে যোগাড় করা কঠিন হবে না। পুলিশের কাছে কোন কাজই কঠিন নয়।

তানভির বাগানে একা একা বসে ছিল।

রূপা বারান্দায় আসতেই সে ডাকল, রূপা শুনে যাও তো।

রূপা শান্তমুখে বাগানে নামল। তানভির বলল, তোমার স্যারের কাণ্ড শুনেছ? রফিক ভাই এইমাত্র বলে গেলেন। তিনি বাজার থেকে শুনে এসেছেন। তুমি শুনতে চাও?

'না।'

'না কেন? একটা মানুষকে ঠিকমত জানতে হলে তার ভাল-মন্দ সবই জানতে হয়।'

'আপনার বলার ইচ্ছা খুব বেশি হলে বলুন, শুনব।'

'জোর করে শুনাতে চাচ্ছি না। তবুও আমি মনে করি তোমার শোনা উচিত। তোমার স্যার একটা মেয়েকে নির্জন বাড়িতে রেপ করেছেন, যে কারণে পুলিশ তাকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেছে।'

'আপনি কি এটা বিশ্বাস করেন?'

'বিশ্বাস না করার তো কিছু দেখছি না। নারীসঙ্গবর্জিত একজন মানুষ নির্জন জায়গায় একা একা থাকে . . .।

'নারীসঙ্গবর্জিত অনেক সাধক মানুষও নির্জন জায়গায় একা একা থাকে।'

'তোমার ধারণা উনি সাধক মহাপুরুষ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো আর কিছু বলার নেই।'

'না। আর কিছু বলার নেই।'

রূপা বাগান থেকে উঠে এল। তানভির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেলল, এই বুদ্ধিমতী শক্ত ধাঁচের মেয়েটিকেই তার বিয়ে করতে হবে। জোর করে হলেও করতে হবে। মেয়েটির মনে সাময়িক যে মোহ আছে তা বিয়ের পর কেটে যাবে। অল্পবয়সের মোহ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এই মোহ অনেকটা শিশুদের হামের মত, সবারই হবে। আবার সেরে যাবে।

ওসি সাহেবের পরিকল্পনা কাজ করেছে। লোকজন চলে যেতে শুরু করেছে। মানুষ অসত্যকে সহজে বিশ্বাস করে। মবিনুর রহমানের মেয়েঘটিত ব্যাপার তারা বিশ্বাস করেছে। এর নাম 'মব সাইকোলজি' — এই উত্তর এই দক্ষিণ। মাঝামাঝি কোন ব্যাপার নেই।

ওসি সাহেব ডাকলেন, কবির মিয়া।

ডিউটির সেন্ট্রি বলল, জ্বি স্যার।

'দেখে আস তো মবিনুর রহমান কি করছে?'

'দেখে এসেছি স্যার। উনি ঘুমুচ্ছেন।'

'হারামজাদা।'

হারামজাদা কাকে বলা হল, কেন বলা হল কবির মিয়া ঠিক বুঝতে পারল না। ওসি সাহেব বললেন, লোকজন এখনো আছে?

'কিছু আছে স্যার।'

'হারামজাদা।'

'কিছু বললেন স্যার?'

'না কিছু বলি নাই। তুমি যাও ডিউটি দাও। আর শোন আমি এখন বেরুব। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন থানা ছেড়ে কেউ না যায়।'

ওসি সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়েছে। ভয়ংকর একটা দিন গিয়েছে। বিশ্রামের উপায় নেই। এখন যেতে হবে একটা মেয়ের সন্ধানে, যাকে ফরিয়াদী করে মামলা দাঁড়া করানো যায়। নীলগঞ্জ বাজারে কয়েকঘর পতিতা থাকে। ওদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। অল্পবয়েসী হলে ভাল হয়। বয়স যত কম হবে ততই ভাল। নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

পাওয়া গেল। সাবিহা বেগম নামের পনেরো বছরের এক বালিকা দু'দিন আগের তারিখে থানায় জি.ডি এন্ট্রি করাল। তার গল্পটি এ-রকম — সে সকালে বাড়ি যাচ্ছিল। মবিনুর রহমানের বাড়ির কাছ দিয়ে যাবার সময় মবিনুর রহমান তাকে বলল, তুমি কি বাজারে যাও? সে বলল, হ্যাঁ।

'তুমি আমার জন্যে কিছু লবণ কিনে আনবে? লবণের অভাবে কিছু রাঁধতে পারিছ না। আধা কেজি লবণ আনতে পারবে?'

সে বলল, পারব।

পারব বলল কারণ সে জানে এই পাগল লোকটা একা একা থাকে। স্কুলের শিক্ষক। খুব ভাল মানুষ। আগেও কয়েকবার সে এই মানুষটাকে এটা-ওটা এনে দিয়েছে।

মবিনুর রহমান বলল, আস টাকা নিয়ে যাও। সে টাকা নেবার জন্যে ঘরে ঢুকতেই মবিনুর রহমান দরজা বন্ধ করে দিল। দরজায় খিল দিয়েছিল। সাবিহা কিছু বুঝবার আগেই সে তার হাত ধরল। সাবিহা তখন অনেক চিৎকার করল। কিন্তু তার চিৎকার কেউ শুনল না। তাছাড়া খুব বৃষ্টি হচ্ছিল।

মোটামুটিভাবে বিশ্বাসযোগ্য গল্প।

মিথ্যা গল্প অতি সহজেই বিশ্বাসযোগ্য করা যায়। সমস্যা হয় সত্য গল্প নিয়ে।

জেবার জ্বর এসেছে।

সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ সমস্ত হাত-পা অবশ করে জ্বর এলো। সে দু'বার বমি করে নেতিয়ে পড়ল। তার চোখ রক্তবর্ণ। রফিক ডাক্তার ডাকতে চাইল। সে কঠিন গলায় বলল, না।

রফিক বলল, আচ্ছা থাক, ডাকব না।

রফিকের মা বললেন, এসব কেমন কথা? মেয়ে 'না' বললেই না? জ্বরে হাত-পা পুড়ে যাচ্ছে। তুই ডাক্তারের ব্যবস্থা কর। মেয়ের কথা শুনতে হবে?

রফিক ক্লান্ত গলায় বলল, ওর কথা না শুনে উপায় নেই মা। তুমি বুঝবে না। ওর অমতে কিছু করা যাবে না। ও যা বলবে আমাদের তাই করতে হবে।

'এটা কোন কথা হল?'

'এটা কোন কথা না কিন্তু এটাই সত্যি।'

জেবা বলল, কেউ যেন আমার ঘরে না আসে। দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দাও। দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয়া হল। জেবা ভেতর থেকে সিটকিনি দিয়ে দিল। তার জ্বর আরো বাড়ছে। ঠিকমত পা ফেলে বিছানা পর্যন্ত যেতে পারছে না। ঘরের ভেতরটা গরম। তার শীত লাগছে। প্রচণ্ড শীত। শীতে তার সারা শরীর ঠক ঠক করে কাঁপছে। জেবা বিড়বিড় করে বলল, আমি পারছি না। আমার শক্তি কম। আমি পারছি না। জেবা বিছানায় শুয়ে আছে কুণ্ডুলি পাকিয়ে। তার ঘুম আসছে। প্রচণ্ড ঘুম। ঘুম প্রয়োজন। এই ঘুমের মধ্যেই সে 'নি'দের দেখা পাবে। 'নি'রা তাকে বলে দেবে কি করতে হবে। কারণ সেও একজন 'নি'। রূপা ফুপুর স্যারও 'নি'। তাঁর ক্ষমতা অনেক

বেশি। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, অথচ তিনি তা জানেন না। 'নি'রা তাঁকে কিছু বলছে না কেন? সে কি তাঁকে বলে দেবে?

ঘুমুচ্ছেন মবিনুর রহমান। ঠিক ঘুম না — তন্দ্রাভাব হয়েছে। হাজতের ছোট্ট ঘরটায় তাঁকে বসার জন্য ইজিচেয়ার দেয়া হয়েছে। তিনি ইজিচেয়ারে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। কেন জানি তাঁর বেশ ভাল লাগছে। সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। চারদিকে অন্ধকার। হাজত ঘরের ভেতরে কোন বাতি নেই। বারান্দায় বাতি আছে। একশ' পাওয়ারের বাতি। ইলেকট্রিসিটি খুব দুর্বল। রাত এগারোটার আগে সবল হবে না। বারান্দার বাতি প্রদীপের আলোর মত আলো দিচ্ছে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঢালা বর্ষণ হচ্ছে। নদীর দিক থেকে শোঁ-শোঁ আওয়াজ আসছে। বোধহয় রূপেশ্বরে আবারো বান ডাকবে। এই নদী প্রতি সাত বছর পর পর যৌবনবতী হয়। দু'কূল ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

মবিনুর রহমান আধো-ঘুম আধো-তন্দ্রায় রূপেশ্বরের গর্জন শুনতে পাচ্ছেন। এক সময় সেই গর্জনে কিছু কথা মিশে গেল। নদীর গর্জন কোলাহলের মত শুনাতে লাগল। এক সঙ্গে অনেকেই যেন কথা বলছে। মবিনুর রহমান ঘুমের মধ্যেই অস্বস্তি বোধ করছেন। চেষ্টা করছেন, জেগে উঠতে পারছেন না। ঘুম আরো গাঢ় হচ্ছে। যে কোলাহল এতক্ষণ শুনছিলেন তা একটি নির্দিষ্ট স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

'মবিনুর রহমান।'

'জ্বি।'

'মবিনুর রহমান।'

'জ্বি।'

'মবিনুর রহমান।'

'আমি তো জবাব দিচ্ছি। বারবার ডাকছেন কেন?'

'কি বলছি শুনতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি।'

'আমরা কে মনে আছে?'

'আপনারা 'নি'।'

'হ্যাঁ, তোমার মনে আছে। তুমিও একজন 'নি'।'

'বুঝিয়ে বলুন।'

'সবকিছু বুঝিয়ে বলা যায় না।'

'চেষ্টা করুন।'

'তুমি স্বপ্ন দেখতে পার।'

'স্বপ্ন সবাই দেখে।'

'তোমার স্বপ্ন আর অন্যদের স্বপ্ন এক নয়। অন্যদের স্বপ্ন স্বপ্নই। তোমার স্বপ্ন স্বপ্ন নয়। তুমি যা স্বপ্ন দেখবে তাই হবে।'

'বুঝতে পারছি না।'

'মানুষ পৃথিবীতে এসেছে ছয়চল্লিশটি ক্রমোজম নিয়ে। তোমার ক্রমোজম সংখ্যা সাতচল্লিশ। যারা 'নি' শুধু তারাই এই বাড়তি ক্রমোজম নিয়ে আসে।'

'বাড়তি ক্রমোজমটির কাজ কি?'

'বাড়তি ক্রমোজমটির জন্যেই তুমি স্বপ্নকে মুক্ত করতে পার। কি অসীম তোমার ক্ষমতা তা তুমি জান না, ক্ষুদ্র অর্থে তুমি স্রষ্টা।'

'সব মানুষই স্রষ্টা। সৃষ্টি করাই মানুষের কাজ।'

'তোমার সৃষ্টির ক্ষমতা অসাধারণ ।'

'অসাধারণ?'

'হ্যাঁ অসাধারণ। 'নি'দের জন্ম হয়েছে স্বপ্ন দেখার জন্যে। তারা স্বপ্ন দেখে — নতুন সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি তাই চায়।'

'একদিকে সৃষ্টি মানেই অন্যদিকে ধ্বংস।'

'হ্যাঁ তাই ঠিক। প্রকৃতি তাই চায়। প্রকৃতি চায় তার জগতে ক্রমাগত ভাঙাগড়ার খেলা চলুক।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তোমার কি মনে আছে তুমি একবার চিরজ্যোৎস্নার একটি জগতের কথা চিন্তা করেছিলে, মনে আছে?'

'আছে।'

'সেই জগৎ তৈরি হয়েছে। অপূর্ব সেই জগৎ।'

'আমি কি সেই জগৎ দেখতে পারি?'

'হ্যাঁ পার। তবে কল্পনায়। তোমার পৃথিবী যে মাত্রায় আছে, তোমার জগৎ সেই মাত্রায় নয়।'

'আমি কি আমার পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করতে পারি?'

'পার। তবে 'নি'-দের সাবধান করে দেয়া হয় যেন এই কাজটি তারা না করে।'

'অসুবিধা কি?'

'এতে প্রাকৃতিক নিয়মে অসুবিধা দেখা দেয়। প্রকৃতি তার আইনের ব্যতিক্রম সহ্য করে না। আইন অমান্যকারীকে প্রকৃতি কঠিন শাস্তি দেয়।'

'আমি এই পৃথিবীতেই কিছু-একটা সৃষ্টি করে দেখতে চাই প্রকৃতি আমাকে কিভাবে শাস্তি দেয়।'

'প্রকৃতির শাস্তি ভয়াবহ। আমরা তোমাকে সাবধান করবার জন্যেই আজ এসেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমার ইচ্ছা হবে প্রকৃতির নিয়ম ভাঙতে। সেটি যেন না হয় তাই বলতেই আমাদের আসা। তুমি তোমার কাজ কর। তোমার অসীম ক্ষমতা ব্যবহার কর।'

'আপনারা চলে যান। আমার কথা বলতে ভাল লাগছে না।'

'আমরা চলে যাব। তোমাকে সাবধান করেই চলে যাব।'

'আমার প্রয়োজনে আর কি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি?'

'হ্যাঁ পার।'

'ধন্যবাদ। এখন যান।'

'তুমি যে এখন এক সাময়িক অসুবিধার মধ্যে আছ তা নিয়ে কি তুমি আলাপ করতে চাও?'

'হাজতবাসের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'না। এটা কোন সমস্যা নয়।'

'নি'-দের যাবতীয় সমস্যা থেকে দূরে রাখার সব ব্যবস্থা প্রকৃতি করে রাখে। তোমার বেলাতেও তা করে রেখেছে। তুমি যখন যেখানে ছিলে সেখানেই তোমার পাশে রাখা হয়েছে দু'জন করে অসাধারণ মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ, যারা মানসিকভাবে অন্যদের প্রভাবিত করতে পারে। 'নি'রা প্রকৃতির প্রিয় সন্তান।

'বুঝতে পারছি না।'

নীলগঞ্জে তোমার দু'জন সাহায্যকারী আছে। একজন কালিপদ, অন্যজন জালালুদ্দিন। এদের মানসিক ক্ষমতা অসাধারণ। তারা সব রকম বিপদে তোমাকে সাহায্য করবে। যদিও তারা তা জানে না। তোমাকে সাহায্য করার জন্যে আরো একজন সাহায্যকারীকে আনা হয়েছে। তার নাম জেবা। জেবাও তোমাকে সাহায্য করছে। 'নি' প্রকৃতির বিশেষ সৃষ্টি। এদের রক্ষা করার সব রকম দায়িত্ব প্রকৃতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে।

'এইসব শুনতে আমার ভাল লাগছে না। ঘুম পাচ্ছে, আমাকে ঘুমুতে দিন।'

স্বপ্ন ঝাপসা হয়ে গেল। মবিনুর রহমান গাঢ় ঘুমে তলিয়ে গেলেন। আরেকটি স্বপ্ন দেখলেন। সেই স্বপ্ন অপূর্ব ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ছে আকাশে। তাদের কলকাকলিতে চারদিক মুখরিত। তারা এক আনন্দময় সংগীত সৃষ্টি করছে। আলো আঁধারী এক জগতে তাদের সংগীত মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

হেড মাস্টার সাহেবের গরুর জন্যে জাবনা তৈরি করা হচ্ছে। কালিপদ মাথা নিচু করে কাজটা করছে। হেড মাস্টার সাহেব পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে-মুখে চিন্তিত ভাব। মবিনুর রহমানের গমের ব্যাপারটা এত দূর গড়াবে তা তিনি ভাবেননি। এ তো বড়ই যন্ত্রণা হল!

হেড মাস্টার সাহেব বললেন, গরু কিছু মুখে দিচ্ছে না, ব্যাপার কি কালিপদ?

কালিপদ চোখ তুলে তাকাল। চোখ নামিয়ে নিল না। তাকিয়েই রইল। এ-রকম সে কখনো করে না। হেড মাস্টার সাহেব অকারণেই খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। প্রথম প্রশ্নটি দ্বিতীয়বার করলেন, — গরু কিছু মুখে দিচ্ছে না, ব্যাপার কি কালিপদ?

কালিপদ বলল, সেইটা গরুরে জিজ্ঞেস করেন।

হেড মাস্টার সাহেব হতভম্ব হয়ে গেলেন। হারামজাদার এত বড় সাহস! কি কথা বলছে? তারপরেও তাকিয়ে আছে। চোখ নামিয়ে নিচ্ছে না। জুতিয়ে হারামজাদার গাল ভেঙে দেওয়া দরকার।

'কি বললা কালিপদ?'

'বললাম, গরু কেন খায় না সেইটা গরুরে জিজ্ঞাসা করেন। আমি গরুর ডাক্তার না।'

'তোমার সাহস অনেক বেশি হয়ে গেছে। তুমি কি বলছ তুমি নিজেও জান না।'

কালিপদ এইবার চোখ নামিয়ে নিয়ে ক্ষীণ গলায় বলল, আমার মাথার ঠিক নাই। নিরপরাধ একটা মানুষরে কোমরে দড়ি বাইন্দা নিয়া গেছে। আমার মাথার ঠিক নাই। কি বলতে কি বলছি, মনে কিছু নিয়েন না।

'নিরপরাধ বলছ কেন? তুমি কি জান না সে একটা মেয়ের সর্বনাশ করেছে? মেয়ের নাম সাবিহা।'

'এইগুলা দুষ্ট লোকের মিথ্যা রটনা।'

'তোমারে কে বলল মিথ্যা রটনা?'

'আমি জানি মিথ্যা রটনা। আফনেও জানেন, আফনে জানেন না এমন না। অখনও সময় আছে স্যার।'

'কি বললা?'

'বললাম অখনো সময় আছে। সময় শেষ হইলে আফসোস করবেন।'

'কি বলছ তুমি?'

'অতি সত্য কথা বলতেছি। অতি সত্য কথা।'

কালিপদ হাঁটা ধরল। বিস্মিত হেড মাস্টার বললেন, যাও কোথায় তুমি?

'সাবিহা বেগমের কাছে যাই।'

কালিপদ চলে গেছে। হেড মাস্টার সাহেবের পা কাঁপছে। ঠকঠক করে কাঁপছে। অকারণ ভয়ে সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছে। এরকম কেন হচ্ছে তিনি বুঝতে পারছেন না। পিপাসায় বুক শুকিয়ে কাঠ। তিনি আস্তে আস্তে মাটিতে বসে পড়লেন। হড়হড় করে বমি হয়ে গেল। বমিতে লাল লাল কি দেখা যাচ্ছে। রক্ত না-কি? হেড মাস্টার সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন — ইয়া মাবুদ। ইয়া মাবুদ।

বাজারের একটা ঘরের সামনে কালিপদ দাঁড়িয়ে আছে। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মিষ্টি চেহারার একটা মেয়ে এক সময় বাইরে এসে বলল, কারে চান গো?

'তোমারে চাই। তোমার নাম সাবিহা না?'

'হ।'

'তুমি মিথ্যা মামলা কেন করছ?'

কালিপদ তাকিয়ে আছে তীব্র দৃষ্টিতে। সাবিহা সেই দৃষ্টি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না। কালিপদ আবার বলল, কেন তুমি মিথ্যা মামলা করলা?

'ওসি সাহেব বলছেন।'

'এখন ওসি সাহেবের কাছে আবার যাও। ওসি সাহেবরে বল — তুমি এইসবের মধ্যে নাই।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'কখন যাইবা?'

'এখনই যাব।'

'যাও দিরং করবা না।'

'জ্বে-না। আমি দিরং করব না।'

সাবিহারও ঠিক হেড মাস্টার সাহেবের মত হল। গা হাত পা কাঁপছে। প্রচণ্ড বমি ভাব হচ্ছে। বুক ধড়ফড় করছে।

জালালুদ্দিন ওসি সাহেবের বাসায় উপস্থিত হয়েছেন। সমস্ত দিনের ভয়াবহ ক্লান্তির পর ওসি সাহেব সবে ঘুমুতে গিয়েছেন। রাত বাজে ন'টা। এত সকাল সকাল তিনি ঘুমুতে যান না। আজ শরীরে কুলুচ্ছে না। এই সময় যন্ত্রণা। ওসি সাহেব বলে পাঠালেন, এখন দেখা হবে না।

জালালুদ্দিন বললেন, এখনই দেখা হওয়া দরকার। ওসি সাহেবের নিজের স্বার্থেই দেখা হওয়া দরকার।

ওসি সাহেব বের হয়ে এলেন। কঠিন গলায় বললেন, কি ব্যাপার?

'গম চুরি মামলাটা নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।'

'আমার সঙ্গে কি কথা?'

'হেড মাস্টার সাহেব স্বীকার করেছেন যে গম চুরির মামলাটা মিথ্যা মামলা।'

'কি বললেন?'

'যা সত্য তাই বললাম। গম চুরি বিষয়ক সব দায়-দায়িত্ব উনি নিয়েছেন। কাজেই মবিনুর রহমান সাহেবকে ছেড়ে দিতে হয়।'

'উনাকে অন্য কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে। কারণটা আপনাকে বলেছি ...।'

'হ্যাঁ বলেছেন। সাবিহা নামের ঐ মেয়ে বলছে যে আপনি তাকে দিয়ে মিথ্যা মামলা করিয়েছেন।'

অনেকক্ষণ ওসি সাহেব কথা বলতে পারলেন না হচ্ছে কি এসব। তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, সে বললে তো হবে না?

'হবে। সে বললেই হবে। নীলগঞ্জের সব মানুষ এসে ভেঙে পড়বে থানার সামনে। আপনার মহাবিপদ ওসি সাহেব।'

'ভয় দেখাচ্ছেন না কি?'

'না, ভয় দেখাচ্ছি না। যা হতে যাচ্ছে সেটাই আপনাকে বলছি। মানুষ ক্ষেপে গেলে ভয়ংকর হয়ে যায় ওসি সাহেব। ক্ষ্যাপা মানুষ বন্দুক মানে না।'

'আপনি কি মবিনুর রহমান সাহেবকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছেন? সেটা করা যায় . .

'শুধু সেটা করলে তো হবে না। আপনি যে অন্যায় করেছেন তার জন্যে সবার কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। কানে ধরে দশবার উঠবোস করবেন।'

'কি বললেন?'

'অপমানসূচক একটা কথা বললাম ওসি সাহেব। খুবই অপমানসূচক কথা। কিন্তু প্রাণে বাঁচতে হলে এ ছাড়া পথ নেই। হেড মাস্টার সাহেবও একই জিনিস করবেন। উনি রাজি হয়েছেন। বুদ্ধিমান লোক তো। বিপদ আঁচ করতে পেরেছেন। আপনার বুদ্ধি কম। আপনি বিপদ টের পাবেন শেষ সময়ে, যখন করার কিছু থাকবে না।'

ওসি সাহেব জালালুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি কম বুদ্ধির মানুষ না। তিনি বিপদ টের পাচ্ছেন। ভালই টের পাচ্ছেন। তাঁর কপালে ঘাম জমছে। পা কাঁপছে। তৃষ্ণা বোধ হচ্ছে। প্রচণ্ড বমি ভাব হচ্ছে।

জেবার জ্বর অসম্ভব বেড়েছে।

জ্বর ঠিক কত তা বোঝা যাচ্ছে না কারণ তার গায়ে থার্মোমিটার ছুঁয়ানো যাচ্ছে না। সে কাউকেই তার কাছে আসতে দিচ্ছে না।

আফজাল সাহেব রফিককে বললেন, মেয়ে না করছে বলে কেউ তার কাছে যাবে না এটা কেমন কথা? মাথায় পানি ঢালতে হবে। ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করাতে হবে।

রফিক বলল, কোন লাভ হবে না বাবা। ওর অনিচ্ছায় কিছু করা যাবে না।

'যাবে না কেন?'

'আপনি বুঝবেন না বাবা, অনেক সমস্যা আছে।'

'জ্বরে তোর মেয়ে পুড়ে যাচ্ছে আর তুই দেখবি না?'

'এরকম ভয়ংকর জ্বর তার মাঝে মাঝে হয়, আবার আপনাতেই সারে। ডাক্তার ডাকতে হয় না।'

জেবা ক্ষিপ্ত গলায় বলল, তোমরা সবাই এখানে ভীড় করে আছ কেন? তোমরা যাও। যাও বললাম। আর ঘরে বাতি জ্বালিয়েছ কেন? বললাম না বাতি চোখে লাগে? বাতি নিভিয়ে দাও।

বাতি নিভিয়ে রফিক সবাইকে নিয়ে বের হয়ে এল। তার মিনিট দশেকের ভেতর জেবা বের হয়ে এল। সহজ স্বাভাবিক মানুষ। জ্বর নেই। চোখে-মুখে ক্লান্তির কোন ছোঁয়াও নেই। যেন ঘুমুচ্ছিল, ঘুম থেকে উঠে এসেছে। জেবা বলল, জ্বর সেরে গেছে। ফুপু কোথায়?

রূপা বারান্দাতেই ছিল। সে চোখ তুলে তাকাল। কিছু বলল না। জেবা বলল, ফুপু তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে। আমার সঙ্গে এসো।

জেবা রূপাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। ঘর অন্ধকার। বাতি জ্বালাল। হাসতে হাসতে বলল, তোমার জন্যে খুব ভাল খবর আছে ফুপু।

'কি খবর?'

'তোমার স্যারকে ওরা ছেড়ে দেবে। ছেড়ে না দিয়ে অবশ্যি উপায়ও নেই। হি - হি - হি।'

'তুমি কিভাবে জান ?'

'যেভাবেই হোক জানি। অনেক রাতে তিনি একা একা বাড়ি ফেরার সময় এই বাড়িতে আসবেন।'

'তাও তুমি জান?'

'হ্যাঁ, তাও জানি। তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করছ না?'

'না।'

'আমি সব সময় সত্যি কথা বলি ফুপু। তবু কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে না। তাতে কিছু অবশ্যি যায় আসে না।'

'তুমি মেয়েটা খুব অদ্ভুত জেবা।'

'সব মানুষই অদ্ভুত ফুপু। তুমিও অদ্ভুত। পৃথিবীটাও অদ্ভুত।'

'তুমি একেবারে বড়দের মত কথা বলছ।'

'মাঝে মাঝে আমি বড়দের মত কথা বলি। বড়রা যদি ছোটদের মত কথা বললে দোষ না হয় তাহলে ছোটরা বড়দের মত কথা বললে দোষ হবে কেন? আমি ঘুমুতে যাচ্ছি ফুপু।'

রাত এগারোটার দিকে এ-বাড়ির সবাই ঘুমুতে গেল। ঘুমুতে যাবার আগে আফজাল সাহেব রূপাকে ডেকে বললেন, রূপা, তুমি আগামীকাল রফিকের সঙ্গে খুলনা চলে যাবে।

রূপা বলল, আচ্ছা।

'ওখানেই থাকবে । পরীক্ষার সময় শুধু এখানে এসে পরীক্ষা দিয়ে যাবে।'

'আচ্ছা।'

'তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। এখন কিছুই বলব না। পরে বলব।'

'আচ্ছা।'

'তোমার মা'কে বলেছি তোমার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে দিতে।'

'ঠিক আছে বাবা।'

বাইরে ভাল বৃষ্টি হচ্ছে। বাতাস শোঁ-শোঁ করছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়ছে একে একে। সবার শেষে ঘুমুতে গেল মিনু। সেও ঘুমুতে যাবার আগে রূপার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলল। এমনভাবে বলল যেন কিছুই হয়নি। সব স্বাভাবিক আছে। আগের মতই আছে।

'রূপা, আমাদের সঙ্গে যেতে তোমার আপত্তি নেই তো?'

'আপত্তি হবে কেন? খুলনা আমার খুব যেতে ইচ্ছা করে । আচ্ছা ভাবী, তোমাদের ওখান থেকে সুন্দরবন কি অনেক দূর?'

'না — কাছেই।'

'আমাকে সুন্দরবন দেখাবে না?'

'অবশ্যই দেখাব।'

'সুন্দরবনে ডাকবাংলা আছে? ডাকবাংলায় থাকতে ইচ্ছা করে ভাবী।'

'ফরেস্টের ডাকবাংলা আছে। তোমার ভাইকে বলে ব্যবস্থা করে দেব।'

'ঠিক আছে। ভাবী, তুমি ঘুমুতে যাও। খুব রাত অবশ্যি হয়নি। এগারোটা বাজে। তবু কেন জানি মনে হচ্ছে নিশুতি রাত। তাই না ভাবী?'

মিনু ঘুমুতে গেল। রূপা নিজের ঘরে ঢুকে সুন্দর করে সাজল। চুল বেণী করল। শাড়ি পাল্টাল। অনেকদিন পর চোখে কাজল পরল।

সে অপেক্ষা করছে। জেবার কথা সে বিশ্বাস করছে। এই মেয়েটা কোন-এক বিচিত্র উপায়ে ভবিষ্যতের কথা বলতে পারে। রূপা তার প্রমাণ পেয়েছে।

মবিনুর রহমানকে ছেড়ে দিয়েছে রাত এগারোটায়।

ওসি সাহেব বললেন, চলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। মবিনুর রহমান বললেন, না না, পৌঁছাতে হবে না।

ওসি সাহেব বললেন, আপনি আমার উপর রাগ করবেন না ভাই। ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দেবেন।

'ঠিক আছে। মানুষ মাত্রেই ভুল করে।'

'বৃষ্টির মধ্যে যাবেন কি করে? একটা ছাতা আর টর্চ লাইট দিয়ে দি।'

'টর্চ লাইট লাগবে না। ছাতা দিতে পারেন।'

মবিনুর রহমানকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্যে জালালুদ্দিন এবং কালিপদ ছিল। তিনি অনেক কষ্টে তাদের বিদেয় করলেন। তাঁর কেন জানি একা একা বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করছে। থানার সামনে জড়ো হওয়া মানুষজন কেউই এখন নেই। সবাই ভীড় করেছে নদীর তীরে। নদী ভাঙতে শুরু করেছে। এমনভাবে নদী আগে কখনো ভাঙেনি। নদী ভাঙার দৃশ্য একই সঙ্গে ভয়ংকর এবং সুন্দর।

মবিনুর রহমান ভিজতে ভিজতে এগুচ্ছেন। বৃষ্টি ছাতা মানছে না। বাতাসের কারণেই খুব ভিজছেন। নিজে ভিজছেন তা নিয়ে তিনি চিন্তিত না। টেলিস্কোপটা ভিজে যাচ্ছে এই নিয়েই তিনি চিন্তিত।

রূপাদের বাড়ির কাছে আসতেই তাঁর মনে হল তাঁকে যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে — এই খবরটা রূপাদের দিয়ে যাওয়া উচিত। রাত অবশ্যি অনেক হয়েছে, তবু যাওয়া যায় কারণ বাতি জ্বলছে। এখনো কেউ না কেউ জেগে আছে। সম্ভবত রূপাই জেগে আছে। সে অনেক রাত পর্যন্ত জাগে। পড়াশোনা করে।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতেই তানভির দরজা খুলল। টেলিস্কোপ বগলে মবিনুর রহমান দাঁড়িয়ে। মবিনুর রহমান অপ্রস্তুত গলায় বললেন, ওরা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। আপনারা চিন্তা করবেন এই ভেবে খবরটা দিতে এলাম। ভাল আছেন?

'জ্বি ভাল আছি।'

তানভির দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার ইচ্ছা নয় মানুষটা ঘরে ঢুকুক। তানভির বলল, রফিক সাহেবের ছোটমেয়েটা অসুস্থ। সবাই তাকে নিয়ে ব্যস্ত। এখন ঘুমুচ্ছে। কাউকে ডাকা যাবে না।

মবিনুর রহমান বললেন, আপনি খবর দিয়ে দিলেই হবে। বলবেন আমি এসেছিলাম।

'আমি বলব।'

'কাল. সন্ধ্যায় রূপাকে পড়াতে আসব। বেশ কিছুদিন মিস হল। আর হবে না।'

'কাল আসতে হবে না। রূপা কাল চলে যাচ্ছে।'

'কোথায় যাচ্ছে?'

'খুলনা যাচ্ছে। রফিক সাহেব সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন।'

'এই সময় বেড়াতে যাওয়া কি ঠিক হবে? পরীক্ষার দেরি নেই।'

'সেটা ওদের ব্যাপার। ওরা যা ভাল বুঝে করবে।'

'শুধু ওদের ব্যাপার হবে কেন? আমারও ব্যাপার। আমি ওর শিক্ষক।'

কথাবার্তার এই পর্যায়ে রূপা তানভিরের পেছনে এসে দাঁড়াল। শান্ত গলায় তানভিরকে বলল, আপনি স্যারকে ঘরে ঢুকতে দিচ্ছেন না কেন? দেখছেন না উনি ভিজছেন? দরজা ছেড়ে দাঁড়ান।

তানভির দরজা ছেড়ে দাঁড়াল। রূপা বলল, স্যার ভেতরে আসুন।

'এখন আর ভেতরে আসব না রূপা। তোমাদের খবরটা দিতে এলাম। ওরা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। ভুল করে ধরেছিল। মানুষ মাত্রেই ভুল করে। ওসি সাহেব খুব লজ্জা পেয়েছেন। আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বিশিষ্ট ভদ্রলোক।'

'স্যার আপনি ভেতরে আসুন। আপনাকে আসতেই হবে।'

মবিনুর রহমান ভেতরে ঢুকলেন। রূপা বলল, গামছা দিচ্ছি। মাথা মুছে আরাম করে বসুন। আপনি কি রাতে কিছু খেয়েছেন?

'হঁ্যা, ওসি সাহেব তাঁর বাসা থেকে খাবার এনে খাইয়েছেন।'

'আমি চা এনে দিচ্ছি। আদা চা করে দেব?'

'দাও। বাসার আর মানুষজন কোথায়? সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?'

'জ্বি।'

তানভির দাঁড়িয়ে আছে। অপলক দেখছে রূপাকে। মেয়েটা আজ এত সুন্দর করে সাজল কেন? সে কি জানত তার স্যার আসবেন?

রূপা বলল, তানভিরের দিকে তাকিয়ে আপনি আপনার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। স্যারের সঙ্গে আমার খুব জরুরী কথা আছে। আমি কাল খুলনায় চলে যাচ্ছি। কথাগুলি স্যারকে বলে যাওয়া দরকার।

'কথাগুলি সকালে বললে হয় না?'

'না হয় না। আপনার কাছে হাত জোড় করছি।'

মবিনুর রহমান বললেন, আমি না হয় সকালে আসব।

'না। আপনি চুপ করে বসে থাকুন।'

তানভির ঘর ছেড়ে বারান্দায় গেল। তার মন বলছে এই দু'জনকে এখানে রেখে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না। ব্যাপারটা অন্যদের জানানো দরকার। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সে একজন বাইরের মানুষ। তার কি উচিত অন্যদের জাগানো? তানভির সিগারেট ধরাতে চেষ্টা করছে। বারান্দায় প্রবল বাতাস। দেয়াশলাই ধরানো যাচ্ছে না।

মবিনুর রহমান বিস্মিত মুখে বসে আছেন। রূপার মধ্যে খানিকটা পরিবর্তন তিনি লক্ষ্য করছেন। কিন্তু পরিবর্তনের ধরনটা ঠিক ধরতে পারছেন না। মেয়েটাকে সুন্দর লাগছে। অবশ্যি সুন্দর মেয়েকে সুন্দর তো লাগবেই।

রূপা তার সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, স্যার আপনি কি এখন বাড়িতে যাচ্ছেন?

'হঁ্যা।'

'নদী নাকি খুব ভাঙছে? আপনার বাড়ি ভেঙে পড়েছে কি–না কে জানে?'

'গিয়ে দেখি।'

রূপা বলল, আমি কিন্তু স্যার আপনার সঙ্গে যাব।

'আমার সঙ্গে যাবে মানে?'

'আপনার সঙ্গে আপনার বাড়িতে যাব। আমি এখন থেকে আপনার সঙ্গে থাকব। মবিনুর রহমান দীর্ঘ সময় মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই মেয়েটাকে এখন অচেনা লাগছে। একেবারেই অচেনা। যেন কোনদিন এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় নি।'

'আমার সঙ্গে থাকবে কিভাবে?'

'কিভাবে তা জানি না। আমি থাকব।'

'আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না রূপা।'

'আপনি সব কথা বুঝেন আর আমার সামান্য কথা বুঝেন না?'

'না কিছু বুঝতে পারছি না।'

'আমি এখন আপনার সঙ্গে যাব। গিয়ে যদি দেখি আপনার বাড়ি নদীতে তলিয়ে গেছে তাহলে নৌকায় রাতে থাকব। অবশ্যি এই অবস্থায় নৌকায় থাকা খুব বিপদজনক হবে। তাই না স্যার?'

মবিনুর রহমান হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাঁর মনে হতে লাগল পুরো ব্যাপারটা স্বপ্নে ঘটছে। মাঝে মাঝে তিনি যেমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন এও তেমন কোন অদ্ভুত স্বপ্ন।

'স্যার।'

'বল।'

'সবচে' ভাল হয় যদি আমরা দু'জন এই জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই যাতে কেউ আমাদের খুঁজে বের করতে না পারে।'

মবিনুর রহমান থেমে থেমে বললেন, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে রূপা। তুমি কি বলছ নিজেও জান না। তুমি খুলনায় যাও। বাইরে গেলে ভাল লাগবে।

'স্যার, আপনার ধারণা আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

'কিছু–একটা গণ্ডগোল তো অবশ্যই হয়েছে। আমি উঠি, কেমন?'

'বাড়ি যাচ্ছেন?'

'হঁ্যা।'

'যদি অনেক রাতে একা একা আপনার বাড়িতে উপস্থিত হই আপনি কি করবেন? আমাকে এখানে এনে দিয়ে যাবেন?'

'অবশ্যই দিয়ে যাব।'

রূপা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। দেখতে দেখতে তার চোখ ভিজে উঠল। মবিনুর রহমান উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর ইচ্ছা করছে এই পাগলী মেয়েটার মাথায় হাত দিয়ে দু' একটা সান্ত্বনার কথা বলতে। তা বোধহয় ঠিক হবে না। এ কি ভয়াবহ সমস্যা! সমস্যার ধরন এখনো তাঁর কাছে পরিষ্কার নয়। এই মেয়ে কি চায় তার কাছে?

'রূপা যাই।'

রূপা কিছু বলল না। চেয়ার ছেড়ে উঠেও দাঁড়াল না। মবিনুর রহমান বারান্দায় এসে দেখেন তানভির দাঁড়িয়ে আছে। তিনি নিচু গলায় বললেন, আমি যাচ্ছি। আপনি রূপার দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন। ও বড় ধরনের কোন সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে বলে আমার ধারণা। আপনি লক্ষ্য রাখবেন রূপা যেন রাতে বাড়ি থেকে বের না হয়।

তানভির কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

মবিনুর রহমান অসহায় বোধ করছেন। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, আপনি বরং রূপার বাবা–মা'কে ঘুম থেকে ডেকে তুলুন। ওদের বলুন মেয়েটার দিকে লক্ষ্য রাখতে।

'লক্ষ্য রাখা হবে। আপনি আপনার বাড়িতে যান। রূপাকে নিয়ে আপনার ভাবতে হবে না।'

মবিনুর রহমান বাড়িতে এসে পৌছেছেন। নদী আশেপাশের পুরো অঞ্চল ভেঙে দ্রুতগতিতে এগুচ্ছে — আশ্চর্য তার বাড়িটি ঠিকই আছে। নৌকাও বাঁধা আছে। তিনি জানতেন কিছু হবে না। প্রকৃতি তাঁকে রক্ষা করবে। তিনি একজন 'নি'। তাঁকে সব রকম সমস্যা থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব প্রকৃতির। তিনি প্রকৃতির প্রিয় সন্তান।

ভেবেছিলেন রাতে নৌকায় ঘুমুবেন। নৌকা যেভাবে দুলছে তাতে তা সম্ভব না। তিনি নিজের ঘরেই ঘুমুতে এলেন। যাবার সময় দরজা বন্ধ করে তালা দিয়ে গিয়েছিলেন, এখন তালা খোলা। কেউ ঘরে ঢুকেছিল নিশ্চয়ই। ঘরের জিনিসপত্র যেমন ছিল তেমনি আছে। যে এসেছিল সে কোন কিছুতেই হাত দেয়নি।

চায়ের তৃষ্ণা হচ্ছে। তিনি চুলায় কেতলী বসিয়ে দিলেন। নদীর শোঁ–শোঁ শব্দের সঙ্গে স্টোভের শোঁ শোঁ শব্দ মিশে অন্য এক ধরনের শব্দ হচ্ছে। চুলার সামনে বসে থাকতে থাকতে তাঁর হঠাৎ মনে হল, পৃথিবী শব্দময় হলে কেমন হত? যদি এমন একটি জগৎ থাকতো যেখানে সবই শব্দময়। গাছ অনবরত শব্দ করে যাবে। একেক গাছ থেকে একেক ধরনের শব্দ আসবে। পাথর থেকে শব্দ হবে। বড় পাথরের এক ধরনের শব্দ, ছোট পাথরের এক ধরনের শব্দ। মানুষের শরীরে যেমন ঘ্রাণ থাকে তেমনি শব্দও থাকবে। কারোর গা থেকে আসবে মধুর সংগীতময় শব্দ। কারো গা থেকে আসবে

বিরক্তিকর শব্দ। এ–রকম একটি জগতে রূপার গা থেকে কেমন শব্দ আসবে? নূপুরে ছটফটে ধরনের শব্দ?

ভাবতে ভাবতেই তাঁর এক ধরনের ঘোরের মত হল। তিনি বিচিত্র সব শব্দ শুনতে লাগলেন। কেরোসিনের স্টোভ থেকে শোঁ–শোঁ শব্দ ছাড়াও স্টোভের নিজস্ব শব্দ আসছে। পানি ভর্তি গ্লাস থেকে এক ধরনের শব্দ আসছে, আবার কেতলীর ফুটন্ত পানি থেকে অন্য ধরনের শব্দ। কি আশ্চর্য! তিনি ঘোরের মধ্যেই শুনলেন —

'হচ্ছে তোমার হচ্ছে! এই তো তুমি জগৎ তৈরি করেছ। শব্দময় জগৎ। অপূর্ব! অপূর্ব!!'

'আপনারা কি 'নি'?'

'হ্যাঁ আমরা 'নি'। আমরা তোমার ক্ষমতায় বিস্মিত।'

'আমি তাহলে একটি শব্দময় জগৎ তৈরি করেছি?'

'হ্যাঁ করেছ।'

'আমি আপনাদের এই রসিকতার কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না। পৃথিবী সব সময়ই শব্দময়। শব্দের উৎপত্তি কম্পনে। প্রতিটি বস্তুর নিজস্ব কম্পনাংক আছে। সেই অর্থে প্রতিটি বস্তুই শব্দময়।'

'অবশ্যই প্রতিটি বস্তু শব্দময়। কিন্তু তুমি কল্পনা করেছ এমন মানুষের যারা এই শব্দ ধরতে পারে। সেই অর্থে তোমার জগৎটি নতুন।'

'কোথায় সেই জগৎ?'

'সেই জগতের অবস্থান তোমার মধ্যেই তবে ভিন্ন মাত্রায় বলেই তোমার ধরা–ছোঁয়ার বাইরে। তুমি আরো ভাব। কল্পনাকে আরো ছড়িয়ে দাও। নতুন নতুন জগৎ সৃষ্টি কর।'

'তাতে আমার লাভ?'

'তুমি সৃষ্টির আনন্দ পাচ্ছ। এই আনন্দই তোমার লাভ।'

'যে সৃষ্টি আমি দেখছি না সেই সৃষ্টিতে কোন আনন্দ থাকার কথা নয়।'

'তুমি কি কোন আনন্দই পাচ্ছ না?'

'না।'

'তুমি যখন শব্দময় জগতের কথা ভাবছিলে তখন কি আনন্দ পাওনি?'

'পেয়েছি।'

'সেই আনন্দ কি অসম্ভব তীব্র ছিল না?'

'হ্যাঁ ছিল।'

'ঐটিই তোমার লাভ। শব্দময় জগতের কথা ভাবতে ভাবতে তোমার নিজের জগৎও হয়ে গেল শব্দময়। সেই অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?'

'বিচিত্র !'

'শুধু বিচিত্র? আর কিছু না? আনন্দে কি তখন তোমার শরীর ঝনঝন করছিল না?'

'করছিল।'

'তোমার কল্পনা যতই উন্নত হবে তোমার আনন্দের পরিমাণ হবে ততই তীব্র। আমরা গভীর আগ্রহ নিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'কেন?'

'কারণ তোমার আনন্দ আমাদেরও আনন্দ। আমরাও তো 'নি'। তোমার জন্ম থেকেই আমরা তোমার উপর লক্ষ্য রাখছি। তোমার প্রতিটি কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করছি।'

'প্রতিটি কার্যকলাপ?'

'হ্যাঁ, প্রতিটি কার্যকলাপ। তুমি যেন নীলগঞ্জ আস সে জন্যে সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। তুমি যাতে এই ভাঙা বাড়িতে এসে উঠ সেই ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কারণ তোমার ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যে নির্জন একটি বাড়ি প্রয়োজন ছিল।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ তাই। তুমি টেলিস্কোপের কথাই চিন্তা করে দেখ। একটি প্রথম শ্রেণীর এস্ট্রনোমিক্যাল টেলিস্কোপ তুমি ব্যবহার করছ। টেলিস্কোপটি তুমি কিনেছ একটি পুরানো ফার্নিচারের দোকান থেকে। তুমি সেখানে গিয়েছিলে ইজিচেয়ার কিনতে। মনে আছে?'

'আছে। তাহলে কি আপনারা বলতে চান সব কিছুই পূর্ব নির্ধারিত?'

'হ্যাঁ।'

'রূপা মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয়ও কি পূর্ব নির্ধারিত?'

'হ্যাঁ পূর্ব নির্ধারিত। বিশেষ প্রয়োজনেই রূপাকে ব্যবহার করা হচ্ছে।'

'কি প্রয়োজন?'

'তুমি যে সব জগৎ তৈরি করছ সেসব জগতের মানুষ তোমার মতই আবেগশূন্য। তীব্র আবেগের সঙ্গে তোমার পরিচয়ের প্রয়োজন হয়েছে সে কারণেই, যাতে তোমার জগতের মানুষদের তুমি অন্য রকম করে তৈরি করতে পার।'

'আপনারা কি ভবিষ্যৎ বলতে পারেন?'

'পারি না। আবার এক অর্থে পারি।'

'রূপা এখন কি করবে বলতে পারেন?'

'না, পারি না। প্রকৃতি খানিকটা অনিশ্চয়তা রেখে দেয়। রূপা ঝড়-বৃষ্টির রাতে এখানে ছুটে আসতে পারে, আবার আসতে নাও পারে, আবার অন্য কিছুও করতে পারে।'

'তাহলে অনিশ্চয়তা সামান্য বলছেন কেন? অনেকখানি অনিশ্চয়তা।'

'হ্যাঁ, অনেকখানি।'

'আপনারা বলছেন 'নি'-রা প্রচণ্ড ক্ষমতাসম্পন্ন। এই অনিশ্চয়তা তারা দূর করতে পারে না!'

'না। অনিশ্চয়তা প্রকৃতিরই নিয়ম। প্রকৃতি তার নিজের নিয়ম ভঙ্গ করে না।'

মবিনুর রহমানের ঘোর কেটে গেল। কেতলীতে পানি টগবগ করে ফুটছে। তিনি চা বানিয়ে খেলেন। হাওয়ার বেগ আরো বাড়ছে। তুমুল বর্ষণ। ধুপধুপ শব্দে নদী ভাঙতে ভাঙতে এগুচ্ছে। যে হারে এগুচ্ছে তাতে মনে হয় আজ রাতের মধ্যেই নদী তাঁর বাড়ি গ্রাস করে নেবে। তিনি তেমন চিন্তিত বোধ করছেন না। বরং ভালই লাগছে। তিনি রাত দু'টোর দিকে ঘুমুতে গেলেন। চাদর মুড়ি দিয়ে সবে শুয়েছেন। হাত বাড়িয়েছেন হারিকেনের সলতা কমিয়ে দেবার জন্যে। এমন সময় দরজায় প্রবল ধাক্কার শব্দ হল। তিনি বললেন, কে?

বাইরে থেকে তানভিরের গলা শোনা গেল।

'দরজা খুলুন মাস্টার সাহেব।'

'কি ব্যাপার?'

'দরজা খুলুন। তারপর বলছি।'

তিনি দরজা খুললেন। তানভির একা নয়। রূপার দুই ভাই — রফিক এবং জহিরও তার সঙ্গে এসেছে। রফিক কঠিন গলায় বলল, রূপা কি আপনার এখানে?

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, না তো!

'আপনি কি সত্যি কথা বলছেন মাস্টার সাহেব?'

'মিথ্যা বলার প্রয়োজন কখনো বোধ করিনি। রূপাকে কি পাওয়া যাচ্ছে না?'

'না।'

তানভির বলল, আমরা আপনার নৌকাটা একটু দেখব। নৌকা কি ঘাটে বাঁধা আছে?

'থাকার কথা। আসুন যাই।'

নৌকা বাতাসের প্রবল ঝাপ্টায় উলট-পালট খাচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে দড়ি ছিঁড়ে যাবে। রফিক বলল, আপনি রাতে আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন তখন রূপা আপনাকে কি বলেছে?

'আমার এখানে আসতে চেয়েছিল, আমি নিষেধ করেছিলাম।'

তিনজনই ক্রুদ্ধ দ্রষ্টিতে তাকিয়ে আছে। জহির হিসহিস করে চাপা গলায় বলল, রূপার যদি কিছু হয় তাহলে আমি আপনাকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করব। কেউ আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না। কেউ না।

তারা তিনজন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে।

মবিনুর রহমান একা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্ধকার রাতে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টিতে ভিজতে তাঁর ভাল লাগছে। চোখের সামনে নদী। নদীর জল, সমুদ্রের জলের মতই অন্ধকারে জ্বলছে। অদ্ভুত লাগছে তাকিয়ে থাকতে। তাঁর ভাল লাগছে। এক ধরনের তীব্র আনন্দ বোধ করছেন।

সমস্ত রাত তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলেন। ভোরবেলা প্রবল জ্বর নিয়ে ঘরে ফিরলেন। হাত–পা অবশ হয়ে আছে। ভেজা কাপড় বদলাবার শক্তিও নেই। তিনি ভেজা কাপড়েই বিছানায় শুয়ে পড়লেন। জ্বর বাড়তেই থাকল। জ্বরের ঘোরে বেশ কয়েকবার তাঁর মনে হল অসংখ্য বুড়ো মানুষ তাঁর দিকে তাকিয়ে মিনতির সঙ্গে বলছে — তুমি অসম্ভব ক্ষমতাধর একজন নি। তোমার অকল্পনীয় ক্ষমতা। কিন্তু তুমি সীমা লংঘনের চেষ্টা করবে না। প্রকৃতি সীমা লংঘনকারীকে সহ্য করে না। প্রকৃতি কাউকে সীমা লংঘন করতে দেয় না। কাউকেই না। তোমাকেও দেবে না।



ভোরবেলায় সূর্য উঠার আগেই কালিপদ এল মবিনুর রহমান সাহেবের খোঁজ নিতে। সে আগেই আসত, মহা সমস্যায় পড়ে আসতে পারেনি। সমস্যা তার একার না, সবার সমস্যা। নদী ভাঙতে ভাঙতে এগুচ্ছে। অতি দ্রুত এগুচ্ছে। লোকজন সরিয়ে দিতে হচ্ছে। বাজারের পুরোটাই চলে গেছে নদীর ভেতর। ঘটনা ঘটেছে অন্ধকার রাতে। লোকজন বুঝতেই পারেনি এত দ্রুত নদী এগুবে। ছ'সাত জন মানুষ মারা গেছে বলে আশংকা করা হচ্ছে। শুধু একজনের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে। আফজাল সাহেবের মেয়ে রূপা। তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। অন্য কারো কোন চিহ্নই এখনো পাওয়া যায়নি।

কালিপদ এসেছে ছুটতে ছুটতে, ভয়াবহ আতংক নিয়ে। হয়ত দেখবে মবিনুর রহমান স্যারের কোন চিহ্নই নেই। সে দূর থেকে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল — নদীর এই অংশটি মোটামুটি শান্ত। ভাঙা বাড়ি এখনো টিকে আছে। ঘাটে নৌকা বাঁধা। মনে হচ্ছে নদী খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে এগুচ্ছে।

ঘরে ঢুকে কালিপদ দেখল মবিনুর রহমান ভেজা কাপড়ে কুণ্ডুলি পাকিয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। তাঁর চোখ রক্তবর্ণ। হাত–পা কাঁপছে।

কালিপদ বলল, কি হইছে স্যার?

মবিনুর রহমান জড়ানো গলায় বললেন, কে?

'স্যার আমি কালিপদ।'

'তুমি কেমন আছ কালিপদ?'

'আপনের কি হইছে স্যার?'

'জ্বর আসছে বলে মনে হয়।'

কালিপদ দ্রুত ঘরের জিনিসপত্র গুছাচ্ছে। মানুষটাকে সরিয়ে দিতে হবে। রাগী নদী কাউকে ক্ষমা করে না। যে কোন মুহূর্তে এখানে চলে আসবে।

'স্যার।'

'হুঁ।'

'এইখানে থাকা যাবে না স্যার।'

'অসুবিধা হবে না। কালিপদ তুমি চলে যাও।'

'আমি স্যার যাব না। আপনারে না নিয়া আমি যাব না।'

'মবিনুর রহমান ক্ষীণ গলায় বললেন, একটা খবর নিয়ে আস। রূপা মেয়েটাকে পাওয়া গেছে কি-না জেনে আস।'

কালিপদ ভেবে পেল না দুঃসংবাদ স্যারকে দেয়া যাবে কি-না। শরীরের এই অবস্থায় কি দুঃসংবাদ দেয়া যায়? তবে মানুষটা খুব শক্ত। এবং রূপাকে যে পাওয়া যাচ্ছে না তাও এই মানুষটা জানে।

'কালিপদ।'

'জ্বি।'

'খবর নিয়ে আস।'

'খবর স্যার জানি। উনার লাশ পাওয়া গেছে। বাঁকখালির কাছে। পরনে নীল শাড়ি। গা ভরতি গয়না।'

'ও আচ্ছা।'

'তাদের বাড়ির সবাই খুব কানতেছে।'

মবিনুর রহমান চোখ বন্ধ করে ফেললেন। এই খবর শোনার জন্যে তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন বলে ভেবেছিলেন। এখন মনে হচ্ছে তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত না। নিজেকে একা লাগছে। মনে হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড গ্রহে তিনি যেন একা জেগে আছেন। বিশাল একটা গ্রহ — গাছ-পালা, ফুল-ফল, নদী, সাগর . . . কিন্তু একটিমাত্র মানুষ। দ্বিতীয় প্রাণী নেই। কল্পনা করতে ভাল লাগছে।

তিনি একজন 'নি'। বলা হয়েছে অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন 'নি'। সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বর বললেন — 'হও'। জগৎ তৈরি হল শূন্য থেকে। এই জগৎ কোথায় ছিল? ছিল ঈশ্বরের কল্পনার। 'নি'রাও কল্পনা থেকে জগৎ সৃষ্টি করতে পারে। অন্তত তাঁকে সে রকমই বলা হয়েছে।

রূপাকে কি তিনি সৃষ্টি করতে পারেন না? এই জগতেই কি তা সম্ভব?

মবিনুর রহমান উঠে বসলেন। এক ধরনের ঘোরে তাঁর শরীর আচ্ছন্ন। রূপা মেয়েটির প্রতি প্রচণ্ড রকম আবেগ তিনি বোধ করছেন। এই আবেগ এই তীব্র আকর্ষণ কোথায় লুকিয়ে ছিল!

কালিপদ বলল, আপনে স্যার চলেন। নদী ভাঙতেছে।

তিনি কিছুই শুনছেন না। তাঁর সমস্ত চিন্তা-চেতনা কেন্দ্রীভূত। রূপার কথা ভাবছেন। গভীরভাবে ভাবছেন। তাঁর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। তিনি কল্পনায় দেখছেন রূপা বসে আছে নৌকায়। রূপার গায়ে হালকা নীল রঙের শাড়ি।

হাত ভর্তি কাঁচের চুড়ি। পান খেয়ে সে ঠোঁট লাল করেছে। গুনগুন করে গান গাইছে। নৌকায় গাদা করে রাখা বইপত্র গুছিয়ে রাখছে।

মবিনুর রহমান এখন আর চারপাশের কিছু স্পষ্ট দেখতে পারছেন না। সব ধোঁয়াটে হয়ে গেছে। কালিপদ ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকছে, তিনি সেই ডাক শুনতে পাচ্ছেন না। এর মধ্যেও তিনি স্পষ্ট শুনলেন —

"মবিনুর রহমান! মবিনুর রহমান!"

তিনি জবাব দিলেন না। তাঁকে ডাকছে 'নি' রা। অসংখ্য বৃদ্ধের মুখ এখন তিনি দেখতে পারছেন। তারা সবাই ভয়নাক উদ্বিগ্ন।

'মবিনুর রহমান। মবিনুর রহমান।'

'বলুন।'

'তুমি এসব কি করছ? তুমি সীমা লংঘন করছ। তুমি মেয়েটিকে এই জগতেই সৃষ্টি করার চেষ্টা করছ। এই চেষ্টা তুমি করতে পার না।'

'আমি পারি। আমি একজন 'নি'। নি'দের ক্ষমতা অসাধারণ।'

'প্রকৃতি সীমা লংঘনকারীকে পছন্দ করে না।'

'যে প্রকৃতি সীমা বেঁধে দেয় তাকেও আমি পছন্দ করি না।'

'তুমি বিরাট ভুল করেছ মবিনুর রহমান। এই পৃথিবীতে দীর্ঘদিন পর পর একজন 'নি' আসে। তুমি এসেছ। কল্পনাতীত ক্ষমতা তোমাকে দেয়া হয়েছে। এই ক্ষমতার অপব্যবহার করবে না।'

'আমি কথা বলতে চাচ্ছি না।'

'রূপাকে তোমার প্রয়োজন নেই।'

'কে বলল প্রয়োজন নেই।'

'আমরা বলছি।'

'তোমরা বললে তো হবে না। আমার প্রয়োজন আমি বুঝব। আমি এই মেয়েটিকে আমার জগতেই তৈরি করব।'

'মবিনুর রহমান।'

'আমাকে ডাকাডাকি করে কোন লাভ হবে না। আমি আমার প্রচণ্ড ক্ষমতা অনুভব করছি। প্রতিটি রক্ত কণিকায় অনুভব করছি। আমি সেই ক্ষমতার পুরোটা ব্যবহার করব।'

মবিনুর রহমান কিছুক্ষণের জন্যে বাস্তবে ফিরে এলেন। কালিপদ চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

'কালিপদ!'

'জ্বি।'

'একটু বাইরে গিয়ে দেখ তো নৌকায় কি কাউকে দেখা যায়?'

কালিপদ ঘর থেকে বের হয়ে চমকে উঠল। ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে এল। নদী ভাঙতে শুরু করেছে। ভয়ংকর গর্জন হচ্ছে নদীতে। নৌকা দুলছে কাগজের নৌকার মত। আশ্চর্য ব্যাপার, নৌকার ভেতর কাকে যেন দেখা যায়। কালিপদ বলল, কে কে? কেউ জবাব দিল না কিন্তু কালিপদ স্পষ্ট শুনল কেউ-একজন যেন গুনগুন করে গান গাইছে। মিষ্টি মেয়ে গলা।

কালিপদ আবার ডাকল — কে? নৌকার ভিতরে কে? আশ্চর্য, কথা বলে না। মানুষটা কে?

মবিনুর রহমান বের হয়ে এলেন। কালিপদের দিকে তাকিয়ে বললেন — তুমি চলে যাও কালিপদ। এক্ষুণি যাও। এক্ষুণি।

মবিনুর রহমানের গলায় এমন কিছু ছিল যে কালিপদ ভয় পেয়ে ছুটে চলে গেল। সে দৌড়াতে দৌড়াতে যাচ্ছে। একবারও পেছন ফিরে তাকাচ্ছে না।

নদী ভাঙতে ভাঙতে এগুচ্ছে মবিনুর রহমানের দিকে। তিনি তা দেখেও দেখছেন না। মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন। তাকিয়ে আছেন নৌকার দিকে। আকাশ ঘন কৃষ্ণবর্ণ। মেঘের পর মেঘ জমছে। ভয়াবহ দুর্যোগের আর দেরি নেই।

মবিনুর রহমান উঁচু গলায় ডাকলেন — রূপা, রূপা!

নৌকার ভেতর থেকে কাঁচের চুড়ির শব্দ হচ্ছে। নীল শাড়ির আভাস খানিকটা পাওয়া গেল। ফর্সা চুড়ি পরা হাত এক পলকের জন্যে বের হয়ে এল। মবিনুর রহমান চোখ বন্ধ করে আছেন। তিনি তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করবেন।

তিনি জানেন প্রকৃতি এই অনিয়ম সহ্য করবে না। নদী কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে গ্রাস করবে। তিনি আবার ডাকলেন — রূপা, রূপা!

রূপা নৌকার ভেতর থেকে বের হয়ে এল।

তিনি কোমল গলায় বললেন, কেমন আছ রূপা?

রূপা বলল, স্যার আমার ভীষণ ভয় লাগছে।

নদী এগুচ্ছে। নদীর জল ফুলেফেঁপে উঠছে। মবিনুর রহমান দাঁড়িয়ে আছেন।

রূপা আবার বলল, স্যার আমার ভয় লাগছে। খুব ভয় পাচ্ছি স্যার।

মবিনুর রহমান হাসলেন। তাঁর পায়ের নিচের মাটি কাঁপছে। প্রকৃতি আর তাঁকে সময় দেবে না। তাতে কিছু যায় আসে না। তিনি হাসিমুখে রূপার দিকে তাকিয়ে আছেন।

❀❀❀